মনোরমা

শ্রীঅমলা দেবী

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৬
পুনর্মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২০. ১১. ৪৬

ভূমিকা

যে সক্ষম মানুষ আপনার দুই পায়ের উপর নির্ভর করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, তাহাকে বহন করিবার ধৃষ্টতা অমার্জনীয়; সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের রচনা-গৌরবে যিনি আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে পাঠক-সমাজে পরিচিত করিতে গিয়া হয়তো সেই অপরাধই করিতেছি। আমার ভরসা এই যে, 'মনোরমা'-লেখিকা শ্রীমতী অমলা দেবীর আমি অগ্রজ এবং স্নেহের দাবিতে এই জাতীয় অশোভনতা মার্জনীয়।

আমি যখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ছিলাম, শ্রীমতী অমলা দেবীর লেখার সহিত তখন আমার পরিচয় হয়। এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট "চন্দ্র ডাক্তার" ও "নান্যঃ পন্থা" গল্প দুইটি তখনই 'বঙ্গশ্রী'র পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন, "অমলা দেবী" কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের ছদ্মনাম। আমি নিজে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতাম না বলিয়া এই সকল কল্পনার সমর্থন অথবা প্রতিবাদ কিছুই করিতে পারি নাই।

আজিও যে তাঁহার সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা নয়; তবে এবিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছি যে, যদি তিনি স্বয়ং নীরবতার দ্বারা আপনার ভবিষ্যৎকে লেপিয়া মুছিয়া না দেন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজ এই নামের দ্বারা গৌরবান্বিত হইবেন। তাঁহার 'মনোরমা' সেই সম্ভাবনার সাক্ষ্য হইয়া রইল। আমার সৌভাগ্য এই যে, তাঁহাকে পরিচিত

করিবার ভার আমার উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার যেটুকু পরিচয় এই রচনাগুলির মধ্যে আছে, তাহার অধিক কিছু আমিও জানি না; তবে এই রচনাগুলির মধ্যে শক্তির পরিচয় এত অধিক পরিমাণে আছে যে, অন্য পরিচয় না থাকিলেও কিছু যাইবে আসিবে না। রসিক পাঠক-সম্প্রদায় এই কথাটা বুঝিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিবেদন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের কৃপা-বর্ষণ না হইলে এই গল্পগুলির মাসিক-পত্রিকার মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহিরালোকে আত্মপ্রকাশ করা কোনদিন সম্ভব হইত না। এইজন্য দাস মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এবং পাঠক ও পাঠিকাগণকেও অনুরূপ কৃপা-বর্ষণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

২৮।১১।৩৯

শ্রীঅমলা দেবী

মনোরমা

পূজার ছুটিতে কলিকাতা যাইতে হইল। অনেকদিন মফস্বলবাসের পর কলিকাতা যাইতে হইলে মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কেমন করিয়া কলিকাতার জন ও যান সঙ্কুল রাস্তায় পকেট ও প্রাণ বাঁচাইয়া চলাফেরা করিব, চলন্ত ট্রাম ও বাস হইতে নামিবার পর একেবারে ভূপৃষ্ঠশায়ী না হইয়া কেমন করিয়া ঋজু ও সচল অবস্থায় থাকিতে পারিব, ইত্যাদি নানা চিন্তা মনকে অবিরত চোখ রাঙাইয়া ধমকাইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, থাক্, যাইয়া কাজ নাই। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বছর কয়েক নেহাৎ পড়াশুনার জন্য কলিকাতায় বাস করিয়া আবার পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি এবং একটি ক্ষণভঙ্গুর হাই-স্কুলে হেডমাস্টারি লইয়া 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা' বনিয়াছি। পয়সা নাই থাক্, প্রতিপত্তির অভাব নাই; এবং বৎসর কয়েক সেক্রেটারি মহাশয়ের সাকরেদি করিয়া ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিলে ও হাকিম-হুকিমদের সুনজরে পড়িতে পারিলে অদূরভবিষ্যতে রায় সাহেব খেতাবও দুর্লভ হইবে না। অতএব, কি হইবে আমার কলিকাতা যাইয়া? কিন্তু গৃহিণীকে এ কথা বুঝাইবে কে? যেই হোক, আমি নহে; কারণ সম্প্রতি তিনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রকাশ করিতেছেন। কে যে তাঁহাকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, তাহা আমি জানি ; অথচ বলিবার উপায় নাই।

তবে আপনাদিগকে বলিতে পারি। সে আর কেহ নহে, আমার শ্যালক—শ্রীমান নন্দদুলাল। সম্প্রতি বি. এ. পাস করিয়া সে আমার বাড়িতে থাকিয়া আমারই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেছে। দিন কয়েক আগে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় কলিকাতার কোন স্কুলে হেডমাস্টার চাই, এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। নন্দদুলাল তাহার দিদিকে সেই বিজ্ঞাপন দেখাইয়া এই কথা বুঝাইয়াছে যে, আমার মত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লোক একটু চেষ্টা করিলেই ওই চাকুরি পাইতে পারে। বলা বাহুল্য, নন্দদুলালের বক্তব্য তাহার দিদির বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই এবং সেই দিন হইতে অবিশ্রান্ত তাগিদ ও তর্জন দ্বারা গৃহে এমনই দুর্যোগের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কলিকাতা যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিতেছি না। অবশ্য খবরের কাগজ মারফৎ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, কলিকাতায় সম্প্রতি গুণ্ডাদের উপদ্রব বাড়িয়াছে, কোন প্রকারে কবলস্থ করিতে পারিলে 'মহাত্মা গান্ধী' বানাইয়া ছাড়িয়া দিবে। গৃহিণী শুধু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিয়াছেন যে, তাঁহার মাসতুতো ভাইয়ের ভায়রাভাই অজ পাড়াগাঁয়ের লোক হইয়াও একদল স্ত্রীলোককে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কাহারও কানা কড়িটি পর্যন্ত খোয়া যায় নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে স্বীকার করিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গৃহিণী একটু নীরবে থাকিয়া মুচকি হাসিয়া কহিলেন, গুণ্ডার উপদ্রব নয়, ছুঁড়ী মেয়েগুলোর উপদ্রব বেড়েছে বটে। খোয়া যাও তো তাদের হাতেই যাবে। চাঙ্গা হইয়া কহিলাম, যাবই তো। নিশ্চয় যাব। গৃহিণী রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, গেলেই হ'ল, অমরদাদাকে দিয়ে কানে ধ'রে হিড়্হিড় ক'রে টানিয়ে আনব না!

অমরদাদা গৃহিণীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসের কেরানী।

যাই হোক, শুভদিন দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। যাত্রার প্রাক্কালে গৃহিণী ডান হাতে লাল রেশমের সুতা দিয়া একটি কবচ বাঁধিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেই কহিলেন, সাবিত্রী কবচ, দুলাল নিজের পয়সা খরচ ক'রে তোমার জন্যে আনিয়েছে। এমন ভাই কখনও দেখেছ? ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, দেখি নাই; কিন্তু মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিলাম। গৃহিণী কহিলেন, অমরদাদার বাড়িতেই উঠো, উনি গণ্যিমান্যি লোক। কলকাতার সকলেই ওঁকে চেনে, যাকে জিজ্ঞেস করবে, সেইই তোমাকে ওঁর বাড়ি পৌছে দেবে। 'তথাস্তু' বলিয়া যাত্রা করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে হাওড়ায় পৌছিতেই যে প্রশ্ন আজ দশ দিন ধরিয়া আমার মনের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করিতেছে, তাহাই করুণ কণ্ঠে আবেদন করিল, কোথায় যাইব? স্ত্রী তাঁহার গণ্যমান্য অমরদাদার কাছে যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই জন-মহাসাগরে অমরদাদা-রূপ জলবিন্দুটিকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? হঠাৎ ছাত্রজীবনের কলিকাতা-বাসী এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল। ঠনঠনিয়া কালী-মন্দিরের কাছে তাহাদের বাড়ি ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে যদি সে দেহ বা বাড়ি বদল না করিয়া থাকে তো সেখানে গেলে অন্তত এক রাত্রির জন্য আশ্রয় মিলিতে পারে। অতএব কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িয়া ঠনঠনিয়ার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কলিকাতার রাস্তায় সান্ধ্য ভিড় কাটাইয়া চলা প্লীহাগ্রস্ত পল্লীবাসী-গণের পক্ষে সহজ নহে। অতি কষ্টে পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। পিপীলিকাশ্রেণীর মত জনস্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, কেহ

কাহাকেও চেনে না, ডাকিয়া পরিচয় করে না। এতগুলি করিয়া মানুষ প্রতি সেকেণ্ডে চোখের সামনে দিয়া পার হইয়া যাইতেছে, ইহাদের কাহারও কাছে এক বিন্দু সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া ভরসা করিতে পারিলাম না। এক হাতে স্যুটকেস ও আর এক হাতে বিছানার বাণ্ডিল বহিতে বহিতে হাত দুইটা ভারিয়া আসিয়াছিল। হাত বদলাইবার জন্য একটু দাঁড়াইতেই বাম পার্শ্বে কাহার গুঁতা খাইয়া 'উঃ' করিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, একজোড়া তরুণী ভরা নদীতে পাল-তোলা নৌকার মত রূপের তরঙ্গ তুলিয়া তরতর করিয়া চলিয়া গেল। পাঁজরার টনটনানি ভুলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। ইহাদেরই হাতে গৃহিণী খোয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন! কিন্তু হঠাৎ আর এক ধাক্কা খাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, একজন তরুণ—পরিধানে ধুতি মোগলাই পা-জামা ধরনে পরা, গায়ে বড়ুয়া-পাঞ্জাবি, মাথায় পশ্চিমা টুপি, পায়ে নাগরা, দুই চক্ষু আমার চক্ষুঃদ্বয়ের সমান্তরালে রাখিয়া নাসিকা উঁচাইয়া পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় প্রশ্ন করিল, কি ছাখছেন? কখনও ছাখেন নাই? তারপর বাঘের থাবার মত দুই হাতে আমার দুই কাঁধ খামচাইয়া ধরিয়া সজোরে বার দুই ঝাঁকানি দিয়া ছাড়িয়া দিল। সমস্ত দিন অনাহার ও উদ্বেগের জন্য এমনিই মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করিতেছিল, তাহার উপর এই ঝাঁকানিতে সমস্ত মগজ গুলাইয়া একাকার হইয়া গেল। টলিয়া পড়িতে পড়িতে একটা ল্যাম্প-পোস্ট ধরিয়া কোনমতে সামলাইয়া গেলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, চারিদিকে কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমিতে শুরু করিয়াছে। অতএব সত্বর যথাসাধ্য দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিলাম।

কিন্তু ক্ষোভ ও দুঃখ সমস্ত মনটায় কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। আমি বদনগঞ্জ হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ও উক্ত ইউনিয়ন-বোর্ডের

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, থানার দারোগা পর্যন্ত আমাকে খাতির করে, আমাকে কিনা এই অপমান! এবং ইহাই আবার আমাকে নীরবে সহ্য করিতে হইল! আমাদের বদনগঞ্জ হইলে ওই লোকটার কি কিছু বাকি রাখিতাম! চৌকিদার দিয়া ঠেঙাইতাম, ট্যাক্স বাড়াইয়া দিতাম, একঘরে করিতাম, এবং স্কুলে উহার কেউ পড়িলে কিছুতেই প্রমোশন দিতাম না। কিন্তু এত লোক থাকিতে উহারই বা এত রাগ কিসের? গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া তাকানো এমন কিছু দোষের নহে, সে যাহারই দিকে হোক। হঠাৎ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। কারণটা জলের মত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কলিকাতা তো তাহা হইলে রীতিমত হাণ্টিং গ্রাউণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতেছি। শিকার ও শিকারীদের উপদ্রবে নিরীহ ভদ্রলোকের রাস্তা চলিবার উপায় নাই।

কালী-মন্দিরের সামনে আসিয়া হাজির হইলাম। চত্বরে ভক্তিমান ও মতীদের ভিড়; দশ বৎসর আগে যেমনটি দেখিয়াছি, আজও ঠিক তেমনই। একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখিয়া সুটকেস ও বিছানা নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিলাম। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া যুক্তহস্তে নিবেদন করিলাম, মা! চিনিতে পারিতেছ কি? আমি তোমার পুরাতন ভক্ত। কলিকাতায় থাকিতে এ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিবার সময় কোন দিনই তোমার পাওনা প্রণাম ফাঁকি দিই নাই, বরং পরীক্ষার সময়ে ডবল দিয়াছি; উপরন্তু মানত করিয়াছি। অবশ্য কিছুই এখনও দিতে পারি নাই। চাকুরি যদি হয় তো সুদে আসলে সব শোধ করিয়া দিব। কিছু মনে না করিয়া অভাজনকে দয়া কর মা। যেন বন্ধুর সহিত দেখা হয় এবং সে যেন আমাকে চিনিতে পারে। আর একটি কাজ মা! ওই যে পাষণ্ডটা আমাকে বিনাদোষে অপমান করিল, উহাকে শাস্তি দাও।

কলিকাতায় বাস, ট্রাম, মোটর, গুণ্ডা, ইলেক্‌ট্রিকের তার, কলার খোসা কিছুরই তো অভাব নাই মা! যে কোন উপায়ে হোক—

হঠাৎ যেন অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, দাদাবাবু! চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রতন। মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি-চুল, কানের পাতা পর্যন্ত জুলফি, নাকের নীচে প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ, গায়ে হাতকাটা হাফশার্ট, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল। রতন আমাদের গ্রামের ছেলে, জাতিতে কায়স্থ। মাইনর পাস করিয়া গ্রামের পোস্ট-আফিসে পোস্ট-মাস্টারি চাকুরিতে ঢুকিয়াছিল। এমন সময়ে কৈবর্ত্তদের মনোরমা ভরা-যৌবনে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। মনোরমার স্বামীর পোস্ট-আফিসে শ খানেক টাকা ছিল। সেই সম্পর্কে তদ্বির করিতে করিতে রতন যে কখন মনোরমার মনোহরণ করিয়া লইল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। এবং যেদিন টাকা বাহির হইল, সেই রাত্রেই মনোরমাকে লইয়া রতন যে কোথায় উধাও হইল, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। গ্রামের যুবকবৃন্দ সকলেই রতনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—তাহার নৈতিক অধঃপতনের জন্য নহে, পতনের এমন সুবর্ণসুযোগ থাকিতে নিজেরা খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল বলিয়া। আমারও ক্রোধ হইয়াছিল, তবে অন্য কারণে। বিধবা-সম্পর্কীয় অঘটন পল্লীগ্রামে এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। গৃহের পার্শ্বে আঁস্তাকুড়ের মত ইহাকে সহ্য করিয়া লওয়া আমাদের সনাতন অভ্যাস। মধ্যে মধ্যে অবশ্য পরিষ্কারের চেষ্টা হয়, ফলে স্কুলের ও বারোয়ারির জন্য মোটা চাঁদা আদায় হয়। আবার আবর্জনা জমিতে থাকে। তবে রতন দেশ ছাড়িয়া পলাইল কেন? তাহা না করিয়া হতভাগা যদি গ্রামেই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে মনোরমার স্বামীসঞ্চিত অর্থে আমরাও কিছু ভাগ বসাইতে পারিতাম।

যাই হোক, আজ রতনকে দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। ইচ্ছা হইল, ঝাপটাইয়া ধরিয়া উহাকে আলিঙ্গন করি; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া চরণে প্রণত রতনের তৈলচিক্কণ তরঙ্গায়িত চুলের উপর হাত দিয়া শুধু আশীর্বাদ করিলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া চুল ঠিক করিতে করিতে রতন কহিল, কখন এলেন? কহিলাম, এই তো আসছি হে। আমার এক বন্ধু এই পাড়াতেই থাকে, তারই ওখানে উঠব ভাবছি। তুমি তো অনেকদিন এখানে আছ, চল না সঙ্গে একটু—

আমি থাকতে বন্ধুর বাড়িতে ওঠবার কি দরকার? আমার ওখানেই চলুন।

মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, তোমার বাসা—

ডান হাত বাড়াইয়া রতন কহিল, এই কাছেই।—বলিয়া আমার স্যুটকেস ও বিছানার বাণ্ডিল তুলিয়া লইয়া কহিল, চলুন।

ইতস্তত না করিয়া রতনের অনুগামী হইলাম।

যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, বাসায় কি একলা থাক?

রতন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, একলা থাকব কেন? আমার স্ত্রী থাকে।

কহিলাম, স্ত্রী মানে?

মনোরমা। ওকে আমি বিয়ে করেছি—কালীঘাটে, গান্ধীমতে।

গান্ধীমত গান্ধর্বমতের আধুনিক সংস্করণ। রতন মুরুব্বিয়ানা চালে বলিতে লাগিল, আজকাল বামুন, বদ্যি, কায়েত, কৈবর্তদের মধ্যে একচার এ রকম বিয়ে হচ্ছে। সেদিন এক সাহার ছেলের সঙ্গে এক বদ্যির মেয়ের বে হ'ল; খুব ধুমধাম; শহরের গণ্যিমান্যি লোক, বড় বড় টিকিওলা বামুন-পণ্ডিত নেমন্তন্ন খেয়ে গেল; আমারও নেমন্তন্ন ছিল।

কলিকাতার মত শহরে সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি যার তার ভাগ্যে ঘটে না। কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, ভায়ার কি করা হয়?

রতন কহিল, চক্রপাণি প্রেসের হেড কম্পোজিটার। খুব নামজাদা প্রেস। নটবর বটব্যালের নাম শুনেছেন? মস্তবড় লিখিয়ে; রবি ঠাকুরকে পর্যন্ত কানা ক'রে দিয়েছে। ওর সব বই আমাদেরই প্রেসে ছাপা হয়। এখন একখানা খুব ভাল বই ছাপা চলছে, চমৎকার নাম—'পীরিত ও পয়জার'। ম্যানেজারবাবু বলছিল, এই বইখান বেরুলে নটবরবাবু নোবল প্রাইজ পাবে। বাড়িতে ক ফর্মা আছে প'ড়ে দেখবেন এখন।

এ গলি সে গলি ঘুরাইয়া রতন যেখানে আনিয়া হাজির করিল, সেখানে আর পা বাড়াইতে সাহস হইল না। সুড়ঙ্গের মত সরু অন্ধকার গলি, দুই পাশে সারি সারি খোলার ঘর। গলির মুখেই আবর্জনার স্তূপ সৌরভে দিগ্বিদিক আমোদিত করিতেছে। একটা ঘৃতভর্জিত কুকুর ছাড়া কাছে বা দূরে আর কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই।

রতন গুণ্ডার দলে ভিড়ে নাই তো? সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আর কতদূর হে?

এই যে এই গলিতে।—বলিয়া রতন ঢুকিয়া পড়িল। সুটকেস ও বিছানার বাণ্ডিল লইয়া রতন যদি অন্তর্ধান করে তো দুর্গতির সীমা থাকিবে না। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া রতনের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম।

ঘন ভিজা অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ কি একটা ঠাণ্ডা নরম সড়াৎ করিয়া পায়ের উপর দিয়া পার হইয়া যাইতেই আঁতকাইয়া উঠিয়া হাঁকিলাম, রতন!

হাত দশ আগে হইতে রতন কহিল, এই যে, আসুন।

হ্যাঁ হে, এখানে সাপ-টাপ নেই তো? একটা ঠাণ্ডা নরম—

পাগল! কলকাতা শহরে সাপ কোথায় পাবেন? ও ইঁদুর, কিছু ভয় নেই।

মনে মনে কহিলাম, ভরসাও নেই ভায়া। আস্তিক মুনির নাম স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম।

একটা ঘরের সামনে আসিয়া রতন দরজায় ধাক্কা দিয়া হাঁকিল, দরজা খোল। কিছুক্ষণ পরে যে দরজা খুলিল, সে আমাদের গ্রামের কৈবর্তদের কুলত্যাগিনী মেয়ে মনোরমা। বাম হাতে কেরোসিনের ডিবরি, ডান হাত দরজার মাথায়, মুখে শঙ্কা ও বিরক্তি। ঝঙ্কার দিয়া কহিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তারপর আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিতেই রতন আমার পরিচয় দিল, ওঁকে দেখে লজ্জা করতে হবে না। উনি আমাদের গাঁয়ের দাদাবাবু—ওই যে এম. এ. পাস।

মনোরমা আরও ঘোমটা টানিয়া দিয়া 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করিয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

রতনের পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নেহাৎ ছোট একফালি উঠান। সামনে ও পাশে দুইটা ছোট কুঠুরি ও তাহাদের কোলে সরু বারান্দা। বারান্দার এক প্রান্তে চট আড়াল দিয়া রান্না-ঘরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রতন একটা মাদুর পাতিয়া দিতেই, হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া সারাদিনের ক্লান্তির পর সত্যই আরাম পাইলাম। রতন পাশের কুঠুরিতে ঢুকিয়া মনোরমার সহিত ফিসফিস করিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় মনোরমার আবির্ভাব ঘটিল। পশ্চাতে রতন; তাহার হাতে একটা লণ্ঠন। পাত্রী দেখানোর সময় পাত্রপক্ষীয়

লোকদের সামনে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা মেয়েটি যেমন করিয়া হাঁটে, ঠিক তেমনই ভাবে মনোরমা আমার কাছে আসিল, এবং রতন সঙ্গে থাকিয়া তালিম দিতে লাগিল, লজ্জা কিসের? নিজের গাঁয়ের লোক; আমার চেয়েও তোমার বেশি আপনার; তোমার বাবার সঙ্গে ওঁদের কত আত্মীয়তা!

মনোরমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। তারপর উঠিয়া অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক হাত দিয়া আর এক হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

রতন লণ্ঠনটা আমার সামনে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, দাদাবাবুর হাত পা ধোবার ব্যবস্থা ক'রে দিও, আমি আসছি।—বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

•

মনোরমাকে আগে কোন দিন ভাল করিয়া দেখি নাই। পাড়াগাঁয়ের দুই-চারিজন সুশ্রী মেয়ের মত সে জনকয়েক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কাহারও কৌতূহল উদ্রেক করে নাই। কিন্তু যেদিন সে রতনের ঘাড়ে চড়িয়া পল্লী-সমাজের দেওয়াল টপকাইয়া বাহির হইয়া আসিল, সেই দিন হইতে পলায়িত মৎস্যের বৃহত্ত্বের মত তাহার রূপ ও সৌন্দর্যের আতিশয্যের গল্প পল্লীর আসর সরগরম করিয়া তুলিল। তাহার উপর, আমাদের এক ঠাকুরদা কলিকাতা আসিয়া স্বচক্ষে মনোরমার নবলব্ধ প্রণয়ী ও তাহার ঐশ্বর্যের বহর দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া এমনই চমকপ্রদ বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, নিয়মনিষ্ঠা বিধবাদের, এমন কি পতিপ্রাণা সধবাদেরও অনুশোচনার সঞ্চার হইতে লাগিল। আজ এই খোলার ঘরে, দাঁত বাহির করা বারান্দায়, ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া লণ্ঠনের আলোকে মনোরমাকে একান্তে দেখিয়া ভাবিলাম, ঠাকুরদা সবটাই মিথ্যা বলেন নাই; মনোরমা প্রণয়ী ও ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে রূপসী। কলিকাতায় ট্রামে বাসে এবং আজকাল ফুটপাথে, সভা

ও সমিতিতে, থিয়েটারে ও বায়োস্কোপে, নৃত্যগীতের আসরে ও মেয়ে-স্কুলের গাড়িতে, মন্দিরে ও গির্জায় যাহাদের দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ দর্শক-বৃন্দের চক্ষু হইতে লালসা ও জিহ্বা হইতে লালা ঝরিতে থাকে, মনোরমা অনায়াসে তাহাদের দলে ভিড়িয়া যাইতে পারে। আত্মীয় ও সমাজের মায়া কাটাইয়া তুচ্ছ একটা কৈবর্তের মেয়ের হাতে ধরা দিয়াছে বলিয়া রতনের উপর আমার এতদিন ঘৃণার সীমা ছিল না। কিন্তু আজ মনোরমাকে দেখিয়া মনে হইল, সে যদি হৃদয়-শিকারের জন্য ছিপ না ফেলিয়া জাল ফেলিত, তাহা হইলে একটি রতন কেন, ঝাঁকসুদ্ধ রতনের দলকে টানিয়া ডাঙায় তুলিতে পারিত। এমন কি, দুই-চারিটা বড় বড় রুই-কাতলাও বাদ পড়িত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার কথাটাই বলিতেছি। আজ দশ বৎসর ধরিয়া স্কুলে মাস্টারি ও সমাজে পাণ্ডাগিরি করিতেছি। এই সমাজদ্রোহী মেয়েটাকে দেখিয়া আমার হৃদয় যদি বজ্রের মত কঠোর ও খড়্গের মত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিত এবং জিহ্বা যদি চোখা চোখা নৈতিক বাক্যশর হানিয়া পাপিষ্ঠাকে শরশয্যায় লুণ্ঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার পদমর্যাদা রক্ষা পাইত। কিন্তু মনোরমার রূপ ও যৌবনের আতপ্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া আমার জমাট-বাঁধা শীতল হৃদয়ও থসথসে হইয়া উঠিল এবং দৃষ্টি মনোরমার প্রতি একাগ্র ও জিহ্বা বাক্যহীন হইয়া রহিল।

মনোরমা লজ্জা-কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা কহিল, বউদিদি ভাল আছেন?

পথরেখাহীন নির্জন সমুদ্রসৈকতে কপালকুণ্ডলার মত মনোরমা যদি প্রশ্ন করিত, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' আশ্চর্য হইতাম না। কারণ কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মন সরকারী বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া কুপথে বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছিল। মনোরমার প্রশ্ন যেন তাহার কান ধরিয়া ঠিক রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিল।

লোকদের সামনে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা মেয়েটি যেমন করিয়া হাঁটে, ঠিক তেমনই ভাবে মনোরমা আমার কাছে আসিল, এবং রতন সঙ্গে থাকিয়া তালিম দিতে লাগিল, লজ্জা কিসের? নিজের গাঁয়ের লোক; আমার চেয়েও তোমার বেশি আপনার; তোমার বাবার সঙ্গে ওঁদের কত আত্মীয়তা!

মনোরমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। তারপর উঠিয়া অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক হাত দিয়া আর এক হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

রতন লণ্ঠনটা আমার সামনে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, দাদাবাবুর হাত পা ধোবার ব্যবস্থা ক'রে দিও, আমি আসছি।—বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

•

মনোরমাকে আগে কোন দিন ভাল করিয়া দেখি নাই। পাড়াগাঁয়ের দুই-চারিজন সুশ্রী মেয়ের মত সে জনকয়েক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কাহারও কৌতূহল উদ্রেক করে নাই। কিন্তু যেদিন সে রতনের ঘাড়ে চড়িয়া পল্লী-সমাজের দেওয়াল টপকাইয়া বাহির হইয়া আসিল, সেই দিন হইতে পলায়িত মৎস্যের বৃহত্ত্বের মত তাহার রূপ ও সৌন্দর্যের আতিশয্যের গল্প পল্লীর আসর সরগরম করিয়া তুলিল। তাহার উপর, আমাদের এক ঠাকুরদা কলিকাতা আসিয়া স্বচক্ষে মনোরমার নবলব্ধ প্রণয়ী ও তাহার ঐশ্বর্যের বহর দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া এমনই চমকপ্রদ বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, নিয়মনিষ্ঠা বিধবাদের, এমন কি পতিপ্রাণা সধবাদেরও অনুশোচনার সঞ্চার হইতে লাগিল। আজ এই খোলার ঘরে, দাঁত বাহির করা বারান্দায়, ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া লণ্ঠনের আলোকে মনোরমাকে একান্তে দেখিয়া ভাবিলাম, ঠাকুরদা সবটাই মিথ্যা বলেন নাই; মনোরমা প্রণয়ী ও ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে রূপসী। কলিকাতায় ট্রামে বাসে এবং আজকাল ফুটপাথে, সভা

ও সমিতিতে, থিয়েটারে ও বায়োস্কোপে, নৃত্যগীতের আসরে ও মেয়ে-স্কুলের গাড়িতে, মন্দিরে ও গির্জায় যাহাদের দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ দর্শক-বৃন্দের চক্ষু হইতে লালসা ও জিহ্বা হইতে লালা ঝরিতে থাকে, মনোরমা অনায়াসে তাহাদের দলে ভিড়িয়া যাইতে পারে। আত্মীয় ও সমাজের মায়া কাটাইয়া তুচ্ছ একটা কৈবর্তের মেয়ের হাতে ধরা দিয়াছে বলিয়া রতনের উপর আমার এতদিন ঘৃণার সীমা ছিল না। কিন্তু আজ মনোরমাকে দেখিয়া মনে হইল, সে যদি হৃদয়-শিকারের জন্য ছিপ না ফেলিয়া জাল ফেলিত, তাহা হইলে একটি রতন কেন, ঝাঁকসুদ্ধ রতনের দলকে টানিয়া ডাঙায় তুলিতে পারিত। এমন কি, দুই-চারিটা বড় বড় রুই-কাতলাও বাদ পড়িত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার কথাটাই বলিতেছি। আজ দশ বৎসর ধরিয়া স্কুলে মাস্টারি ও সমাজে পাণ্ডাগিরি করিতেছি। এই সমাজদ্রোহী মেয়েটাকে দেখিয়া আমার হৃদয় যদি বজ্রের মত কঠোর ও খড়্গের মত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিত এবং জিহ্বা যদি চোখা চোখা নৈতিক বাক্যশর হানিয়া পাপিষ্ঠাকে শরশয্যায় লুণ্ঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার পদমর্যাদা রক্ষা পাইত। কিন্তু মনোরমার রূপ ও যৌবনের আতপ্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া আমার জমাট-বাঁধা শীতল হৃদয়ও থসথসে হইয়া উঠিল এবং দৃষ্টি মনোরমার প্রতি একাগ্র ও জিহ্বা বাক্যহীন হইয়া রহিল।

মনোরমা লজ্জা-কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা কহিল, বউদিদি ভাল আছেন?

পথরেখাহীন নির্জন সমুদ্রসৈকতে কপালকুণ্ডলার মত মনোরমা যদি প্রশ্ন করিত, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' আশ্চর্য হইতাম না। কারণ কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মন সরকারী বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া কুপথে বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছিল। মনোরমার প্রশ্ন যেন তাহার কান ধরিয়া ঠিক রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিল।

যেমন তেমন করিয়া জবাব দিলাম, ভাল আছে। রতন কোথায় গেল ?

আপনার জন্যে খাবার আনতে গেল। আপনি হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন, এখুনি এল ব'লে।

বাজার থেকে খাবার আনা কেন ? বাড়িতেই কিছু—

কথা শেষ হইতে না হইতেই মনোরমা বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমার হাতে খাবেন আপনি ?

কহিলাম, খাব না কেন ? দোষ কি ? তুমি—মানে—রতন—মানে—তোমরা তো—

এমন সময়ে এক হাতে খাবারের ঠোঙা ও আর এক হাতে দই কিংবা রাবড়ির ভাঁড় লইয়া রতন হাজির হইল। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিল, হাত মুখ ধোন নি এখনও ? বোধ করি মুচকি হাসিয়া কহিল, গল্প করবার মেলা সময় পাবেন, খেয়ে নিন এখন। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, এই যে যাচ্ছি। কিন্তু বাজার থেকে খাবার আনতে গেলে কেন ? বাড়িতেই কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিলেই হ'ত।

খাবারগুলা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে রতন কহিল, বলেন তো কাল থেকে তাইই ব্যবস্থা হবে।

আহার সারিয়া উঠিতেই রতন কহিল, ওই সামনের ঘরে আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে, আপনি শুয়ে পড়ুনগে।

রতনের আত্মীয়তায় ও আতিথ্যে সত্যই মুগ্ধ হইলাম। স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় রসস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতে করিতে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু কক্ষে ঢুকিতেই হৃদয়ের সমস্ত রস শুকাইয়া দানা বাঁধিবার উপক্রম হইল। নেহাৎ ছোট একটা কুঠুরি, জানালার নাম পর্যন্ত নাই। ভাঙা

বাক্স-প্যাঁটরা, হাঁড়িকুড়ি, ছেঁড়া কাগজ ও কাপড়, ইট ও কাঠের টুকরা, শিশি-বোতল, পুরাতন জুতা ও ছেঁড়া মাদুর, বিস্কুট ও বার্লির খোলা টিন ইত্যাদি নানা প্রকারের জঞ্জাল ও আবর্জনায় ঘরটা ঠাসাই হইয়া আছে। তাহারই মাঝে একটুখানি স্থান করিয়া সেই স্যাঁতসেঁতে ভিজা মেঝের উপর মনোরমা আমার শতরঞ্চি ও পাতলা তোষকটি পাতিয়া দিয়াছে। উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, চালে পুরু হইয়া ঝুল জমিয়াছে এবং মালার মত ঝুলিতেছে, সেখানে বিছা তো আছেই, সাপ থাকাও বিচিত্র নয়। এদিকে আলো দেখিয়া ভাঙা বাক্স-প্যাঁটরা ও হাঁড়িকুড়িগুলাতে ছুঁচা ও আরসুলার দল ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল এবং মাথার উপরে দুইটা চামচিকা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল। চামচিকা কি কামড়ায়? সভয়ে বাহির হইয়া আসিলাম। রতন তাহার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল। কহিল, কি হ'ল? বলিলাম, চামচিকে। রতন সাহস দিয়া কহিল, ওরা কামড়ায় না। তা ছাড়া দরজা খোলা পেলেই বেরিয়ে যাবে এখন। চামচিকা দুইটি তবে রতনের পোষা, কিন্তু আমাকে বিশেষ খাতির করিবে কি? তবুও রতনের কথা রাখিয়া, 'ও তাই নাকি! আচ্ছা' বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই চামচিকা-দম্পতি মাথার উপর দিয়া সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া দরজা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলাম, খিল নাই। তবে? সমস্ত রাত্রি এই অরক্ষিত ঘরে, বেওয়ারিশ মালের মত রাত কাটাইতে হইবে নাকি? এদিকে শুনিতে পাইলাম, রতন তাহার দরজায় খিল লাগাইয়া শুইতে গেল। এতক্ষণ যে রতনকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, তাহাকেই মনে মনে তিরস্কার করিতে লাগিলাম, বেশ লোক তো! নিজে খিল আঁটিয়া মজা করিয়া ঘুমাইতে গেলে, আর আমি? দরজায় ঠেস দিয়া সমস্ত

রাত্রি ঝিমাইতে ঝিমাইতে এই ভাঙা জিনিসগুলা পাহারা দিব নাকি? এর চেয়ে ফুটপাথ তো ভাল ছিল। চোর ও গুণ্ডার হাতে পড়িয়া মার খাইতে হইত না। একবার ভাবিলাম, গোটা দুই ভাঙা বাক্স আনিয়া দরজার গায়ে ঠেসাইয়া দিই; কিন্তু যাহারা উহাদের মধ্যে কায়েমী হইয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা যদি সদলবলে আক্রমণ করে, তবে? উহারা তো এমনিই যথেষ্ট লম্ফঝম্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; উহাদিগকে আর ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। অতএব খান চার খান ইট চাপা দিয়া দরজাটা একটু কায়দা করিয়া লইয়া বিছানায় আসিয়া বসিয়া মা কালীকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া আর একবার প্রার্থনা করিলাম, মা! তুমি সর্বত্র বিরাজ করিতেছ, শুধু ঠনঠনিয়ার কালী-মন্দিরে নয়, এই সাপ-বিছা-আরসুলা-সঙ্কুল ভ্যাপসা-গন্ধওয়ালা ঘরেও। অতএব দয়া করিয়া এই অধম সন্তানের উপর একটু দৃষ্টি রাখিও মা! যেন সাপ বিছা কিংবা ইঁদুরে না কামড়ায়, আর চোরে গলা টিপিয়া না মারে। নিমোনিয়া তো নিশ্চয়ই হইবে মা। তবে সেটাকে নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিও। প্রার্থনান্তে জামাটি খুলিয়া বিছানার পাশে ও পকেটস্থ মানিব্যাগটি বালিশের নীচে রাখিলাম। (সুটকেসটি রতন নিজের হেপাজতে রাখিয়াছে।) তারপর লণ্ঠনটির পলিতা যতদূর সম্ভব উস্কাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

নূতন জায়গায় এমনিই সহজে ঘুম আসিতে চাহে না, তাহার উপরে ছুঁচা ও আরসুলার গন্ধে নাক জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বাক্স-প্যাটরা ও হাঁড়িকুড়িগুলার ভিতর হইতে নানা রকমের শব্দ কানে আসিতে লাগিল এবং রুম-মেটদের আপ্যায়ন-আশঙ্কায় চোখ দুইটা মাঝে মাঝে সমস্ত মেঝেটার উপর সন্ত্রস্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাজেই ঘুমের আশা ছাড়িয়া দিয়া ডান হাত দিয়া চোখ দুইটা জোর করিয়া চাপিয়া

রাখিয়া পড়িয়া রহিলাম। বাতি নিবাইলেই আরসুলার দল যেমন ভিড় করে, তেমনই চোখ মুদিতেই নানা রকমের চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় জমাইতে লাগিল। তারপর একে একে সকলকে সরাইয়া দিয়া কেবল মনোরমার চিন্তা সারা মনটা জুড়িয়া রহিল।

মনোরমা হিন্দুঘরের বিধবা। বয়স তাহার যত কমই হোক, সমাজের বিধানমতে সকল সজ্জা ও আভরণ বিসর্জন দিয়া সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ ও আহ্লাদকে পিষিয়া মারিয়া তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজিতে হইবে। সংসারে কাহারও উপর তাহার কোন দাবি থাকিবে না; কিছুতেই কোন অধিকার থাকিবে না; আত্মীয়স্বজনের গৃহে আদর্শ দাসী হওয়াই তাহার একমাত্র সাধনা হইবে। বর্ষণহীন বর্ষার মত যে স্বামী তাহার জীবনে ফসল না ফলাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারই স্মৃতির জের টানিয়া অকর্ষিত ভূমির মত সারাজীবন তাহাকে নিষ্ফলা পড়িয়া থাকিতে হইবে।

মনোরমা কিন্তু সমাজের এই বিধানকে শিরোধার্য করে নাই। সে আবার স্বামী সংগ্রহ করিয়াছে, আবার ঘর বাঁধিয়াছে, আবার নিজের দেহকে সজ্জা ও আভরণে সজ্জিত করিয়াছে, এবং নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার জন্য আবার আয়োজন শুরু করিয়াছে। সমাজ ও ধর্মের দিক হইতে মনোরমার অপরাধের সীমা নাই এবং পরলোকে তাহার শাস্তিরও হয়তো সীমা থাকিবে না; কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ইহলোকে অপমৃত্যুর হাত হইতে মনোরমা বাঁচিয়া গিয়াছে।

মনোরমার কৈবর্তনন্দন স্বামীর কথা মনে করিয়া দুঃখ হইল। হতভাগা শুধু পৃথিবী হইতেই খসিয়া পড়ে নাই, মনোরমার মন হইতেও নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। নিত্য অপরাহ্ণে মনোরমা যখন উঠানে

মাদুর পাতিয়া বসিয়া সস্তা দামের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটি সামনে রাখিয়া তাহার মেঘের মত কালো চুলে কবরী রচনা করে, সীমন্তে সিন্দুর দেয়, রঙিন গামছা দিয়া মুখটি মুছিয়া কপালে টিপ পরে, তখন কাহার কথা মনে পড়িয়া তাহার চোখে কৌতুক ও ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠে? সন্ধ্যায় গা ধুইয়া, লালপাড় ডুরে শাড়িখানি পরিয়া কাহার মঙ্গল-কামনায় দেওয়ালে টাঙানো দেবদেবীর পটের নীচে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে? আরুলকাঠের তক্তাপোশের উপর নিজেদের মলিন শয্যাটি পাতিবার সময়ে কাহার স্পর্শ-স্মৃতি কাঁচা আমের অম্ল-স্মৃতির মত তাহার সারা দেহে রোমাঞ্চ আনে? সে ব্যক্তি তাহার সামাজিক স্বামী কৈবর্তনন্দন নহে, অসামাজিক প্রণয়ী রতন।

এমনই করিয়া চিন্তা করিতে করিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিলাম, আমাদের নন্দদুলাল মহিষ হইয়া আমার সব্জি-বাগানে ঢুকিয়া আমার বড় সাধের বেগুন-চারাগুলি সাবাড় করিতেছে। তাহার দিদি তাহাকে তিরস্কার করা দূরে থাক্, উল্টা তাহার লেজে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিতেছে। রাগিয়া ধমকাইতেই নন্দদুলাল দুই শিঙ বাগাইয়া আমাকে তাড়া করিল। আমি প্রাণভয়ে মাঠঘাট বনবাদাড় ভাঙিয়া ছুটিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা গোয়াল-ঘরে আগড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া দেখিলাম, রতন ও মনোরমা। রতনের বড় বড় গোঁফ ও দাড়ি, মাথায় টাক; মনোরমা তাহার টাকে হাত বুলাইতেছে। আমাকে দেখিয়া রতন হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে দুই গোঁফ শুঁড়ের মত বাড়াইয়া আমার গলা ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া আমাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতেই সে উল্টাইয়া পড়িয়া চ্যাপ্টা হইয়া গেল।

তারপর চামচিকা হইয়া মাথার উপর ঘুরিতে ঘুরিতে আগড়ের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া গেল। পাছে মনোরমাও চামচিকা হইয়া পলাইয়া যায়, এই ভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, দাদাবাবু!

ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, ভোর হইয়া গিয়াছে এবং পাশে বসিয়া মনোরমা ডাকিতেছে, দাদাবাবু!

ফ্যালক্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। মনোরমা কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিল, ও পালিয়ে গেছে।

এখনও স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি! রতন তাহা হইলে সত্যই চামচিকা হইয়া পলাইয়া গিয়াছে! কহিলাম, যাক্‌গে, আসবে এখন। মনোরমা আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, আসবে না দাদাবাবু। নিজের জিনিসপত্তর সব নিয়ে পালিয়েছে।

স্বপ্ন-কুহেলিকা বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া চোখ হইতে ঘুমের আমেজ মুছিতে মুছিতে কহিলাম, কি ক'রে জানলে? মনোরমা চোখ মুছিতে মুছিতে ধরা গলায় কহিল, সকালে উঠে দেখি, ঘরের দরজা খোলা। বেরিয়ে দেখি, বাইরের দরজা খোলা। ফিরে এসে দেখি, ওর কাপড় জামা জুতো ছাতা কিছু নেই।

উঠিয়া বাহিরে আসিয়া মনোরমার শোবার ঘরে ঢুকিলাম। ঘরটি ছোট, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামনে দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি তক্তাপোশ, তাহার উপরে মনোরমাদের বিছানা এখনও পাতা রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালে আঁটা একটা কাঠের আলনায় মনোরমার খান দুই শাড়ি, একটা শেমিজ ও একটা ব্লাউজ রহিয়াছে। নীচে মেঝের উপর কয়েকটা টিনের ছোট বড় প্যাঁটরা থাক করিয়া সাজানো। আর এক পাশের সমস্ত দেওয়ালটা নূতন পুরাতন নানা রকমের ক্যালেণ্ডার

এবং দেবদেবীর সস্তা পটে ঢাকা। এক কোণে একটি মাটির কলসী। তাহারই পাশে একটা কাঠের চৌকির উপর খানকয়েক কাঁসার থালা বাটি ও গেলাস।

চারিদিকে তাকাইয়া কহিলাম, সবই তো রয়েছে মনে হচ্ছে।

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, নিয়ে গেছে আমি দেখেছি। তারপর একটা প্যাটরার ডালা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, দেখুন, চাবি দেওয়া নেই।

প্রশ্ন করিলাম, চাবি কার কাছে ছিল?

ওর কাছে।

রতন প্যাটরাটা লইয়া গেল না কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, আমার স্যুটকেসটি কাল রতন নিজেদের ঘরে তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেটা দেখিতেছি না তো! ত্রস্ত কণ্ঠে কহিলাম, আমার স্যুটকেসটা কোথায়? মনোরমা হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে স্যুটকেস বুঝে না। বুঝাইয়া বলিলাম, চামড়ার বাক্স।

মনোরমা লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে কহিল, সেটাও নিয়ে গেছে তা হ'লে।

চীৎকার করিয়া কহিলাম, বল কি? আমার যে সব আছে তাতে, কাপড়চোপড়, টাকাকড়ি, কাগজপত্তর—

মনোরমা নতমুখে বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল।

প্যাটরার চাবি খুলেছে, আমার স্যুটকেসের চাবি ভেঙেছে, তাতেও তোমার ঘুম ভাঙে নি? কুম্ভকর্ণ নাকি?

মনোরমা ফিক করিয়া হাসিয়া আমার দিকে একবার তাকাইয়া মুখ নামাইল।

মেয়েটা হাসিতেছে! সর্বস্ব হারাইয়া পথে দাঁড়াইয়া কাহারও

মুখে হাসি আসে বলিয়া শুনি নাই। নিশ্চয়ই মেয়েটার সঙ্গে যোগসাজস করিয়া রতন আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া পলাইয়াছে। তারপর আমি সরিয়া গেলে আবার আসিয়া জুটিবে। উকিলের জেরা করিবার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলাম, রতন কোথায় গেছে তুমি সত্যি জান না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িল।

কোথায় প্রেসে চাকরি করে বলছিল যে?

পেরেস নয়, ছাপাখানায়।

ধমকাইয়া কহিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে একই, সেখানে যায় নি?

মনোরমা কহিল, সেখানে চাকরি তো অনেকদিন গেছে।

মনোরমার ধৃত হরিণশাবকের মত অসহায় শঙ্কাকুল দৃষ্টি বুকে আসিয়া খচ করিয়া বিঁধিল। সামলাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলাম, কি করে তা হ'লে?

কিছুই করে না।

তবে চলে কি ক'রে?

মনোরমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, চলে অনেক কষ্টে। আমার টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি যা ছিল সব গেছে। হাতে যে চুড়ি দেখছেন, এ পেতলের। তাতেও দোকানে অনেক ধার। তাগাদার ভয়ে দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বেরোয় না। বাড়িভাড়াও দু মাসের বাকি। বাড়িওলার মেয়েকে ও পড়ায় কিনা, সেইজন্যে এখনও ওঠায় নি। তবে আর বেশিদিন রাখবে না বলেছে। পাশের ঘরে যারা থাকত, তাদের সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের গ্রামের ছেলেরা একবার যাত্রার দল করিয়া রাবণবধ পালা গাহিয়াছিল। সীতাহরণ, জটায়ুবধ, ভোঁতা তরবারি, কঞ্চির ধনুক ও পাকাটির তীর সহযোগে ঘোরতর যুদ্ধ, লম্ফঝম্ফ ও আস্ফালন

ইত্যাদি করিয়া বধ হইবার সময়ে রাবণ গা-ঢাকা দিল। দর্শকবৃন্দ রাবণবধ না দেখিয়া উঠিতে চাহিল না। তখন বাধ্য হইয়া আর একজন নিরীহ লোককে ধরিয়া আনিয়া রাবণ সাজাইয়া বধ করিয়া পালা সাঙ্গ করিতে হইল। 'পরিস্থিতি' অনেকটা সেই রকম দাঁড়াইয়াছে না কি? রতন মনোরমাকে ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছে, তাহার টাকাকড়ি গহনাগাঁটি ঘুচাইয়া স্ফূর্তি করিয়াছে, দোকানে দেনা করিয়াছে, বাড়ি-ভাড়া বাকি ফেলিয়াছে, তারপর সমস্ত কর্মফল আমার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাকে নিঃসম্বল করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই বোঝা যে কবে এবং কেমন করিয়া ঘাড় হইতে নামাইতে পারিব, তাহা ভাবিয়া আমার বুকের ভিতরটা কাঠ হইয়া উঠিল। শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, রতন কি কোথাও যাবার কথা বলেছিল?

মনোরমা কহিল, এখান থেকে চ'লে যেতে হবে, কদিনই বলছিল। তবে আমাকে যে এমন ক'রে ফেলে দিয়ে পালাবে—

মনোরমা কথা শেষ না করিয়া চক্ষে অঞ্চল দিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রতন কিছু লিখে রেখে গেছে?

কি ক'রে জানব? তবে কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত একখানা বই পড়ছিল।

বইটা কোথায়?

বোধ হয় বালিশের নীচে আছে।—বলিয়া বিছানার কাছে গিয়া মনোরমা বালিশের নীচ হইতে আধখানা বই বাহির করিল। বইটা হাতে লইয়া দেখিলাম, একসঙ্গে সেলাই করা 'পীরিত ও পয়জার'-এর কয়েকটা ফর্মা; এই বইটার লেখকই নাকি নোবেল প্রাইজের ভাবী হকদার। বইটা খুলিতেই কবিরাজী ঔষধের মোড়কের মত একটি মোড়ক টুপ করিয়া মাটিতে পড়িল। এই যে দাদাবাবু, চিঠি লিখে

রেখে গেছে।—বলিয়া মনোরমা মোড়কটি তুলিয়া আমার হাতে দিল। অনেক ভাঁজ খোলার পর মোড়কটি একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আকার ধারণ করিল। দেখিলাম, তাহাতে পেন্সিল দিয়া রতন 'বিদায়বাণী' লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—

দাদাবাবু, বিদায়! দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে গনিয়া গনিয়া একশো বার প্রণাম করিতেছি। আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন। বাজারে বিস্তর দেনা; দোকানদার কাল বাড়ি চড়াও করিয়া মারধোর করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। বাড়িওয়ালার বাড়িভাড়া দিতে পারি নাই। তার বদলে সে মনোরমার উপর ভাগ বসাইতে চায়। অতএব সব ছাড়িয়া সংসার ত্যাগ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে ছটফট করিতেছিলাম। আপনি আসিয়া সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। হিমালয় হইতে পরমহংস হইয়া আবার যখন দেশে ফিরিব এবং গুরুগিরির ফালাও ব্যবসা ফাঁদিব, তখন আপনার কথা আমার মনে থাকিবে।

আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ—বাড়িওয়ালার দেনা মিটাইয়া মনোরমাকে আপনার কাছে রাখিবেন। মনোরমা বড় ভাল মেয়ে। সে খুব ভালবাসিতে, সেবা করিতে ও রান্না করিতে পারে। হয়তো আমার জন্য দিনকয়েক একটু খুঁতখুঁত করিবে, কিন্তু তার পরই এমনই ভাবে জড়াইয়া ধরিবে যে, টানিয়া ছাড়াইতে পারিবেন না। অবশ্য মনোরমার মত সুন্দরী ও যুবতী মেয়ের হাত হইতে ছাড়া পাইতে কাহারও ইচ্ছা হইবার কথা নহে, (এমন কি আমারও, নেহাৎ অবস্থাগতিকেই কাটিয়া পড়িতে হইতেছে) এবং আমার বিশ্বাস, আপনারও ইচ্ছা হইবে না। কারণ কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলিয়া যেরূপ ভাবে মনোরমার দিকে তাকাইয়া বসিয়া ছিলেন, তাহাতে বুঝিয়াছি, মনোরমাকে

আপনার ভাল লাগিয়াছে। সেইজন্যই বাড়িওয়ালার বদলে আপনার হাতে মনোরমাকে রাখিয়া গেলাম।

কিন্তু দাদাবাবু, মাস্টারি করিলে কি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবার জো নাই, মাত্র ত্রিশটি টাকা সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন? যদি কোন বিপদ-আপদ হইত, তাহা হইলে এই অজানা জায়গায় কি করিতেন? যাই হোক, এই যৎসামান্য লইয়াই আমাকে চলিতে হইল। পারি তো রাস্তায় আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া লইব। কাপড়চোপড় অবশ্য আপনার ও আমার মিলাইয়া হিমালয় পৌছানোতক চলিবে। এই সামান্য টাকার জন্য আপনি হয়তো মনে মনে রাগ করিবেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ইহার বদলে মনোরমার মত অমূল্য সম্পদ আমি আপনাকে দিয়া গেলাম। আপনার যে কত লাভ হইল, ক্রমে ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতায় আপনার মত লোকের চাকুরির অভাব হইবে না। অতএব মনোরমাকে লইয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া ফুর্তিতে দিন কাটাইতে পারিবেন। বউদিদির কথা ভাবিতেছেন? আমাদের গ্রামে মনোরমার যা সুখ্যাতি, তার কথা শুনিলে বউদিদি আপনার আর মুখদর্শন করিবেন না। বলেন তো তিন পয়সা খরচ করিয়া আমিই বউদিদিকে খবর পাঠাইয়া দিতে পারি।

আর একবার প্রণাম জানাইয়া এই চিঠি শেষ করিতেছি। মনোরমার জন্য মনটা সত্যই একটু কেমন কেমন করিতেছে। কিন্তু উপায় নাই। সংসারাশ্রম আমার পক্ষে সংহারাশ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব মনোরমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিয়া হিমালয়ের গুহাতে শীতে হি-হি করিয়া তপস্যা করিবার জন্য সংসার ছাড়িয়া চলিলাম।

প্রণত

রতন

পুঃ—মনোরমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা বাহুল্য। তবে তাহার শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিবেন। সে অন্তঃসত্ত্বা।

প্রঃ রতন

চিঠিটা পড়িয়া মনের ভাব যাহা হইল, তাহা রতন হাতের কাছে থাকিলে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিতে পারিতাম। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলিকাতায় দুইদিন থাকিয়া এতবড় জুয়াচোর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কে জানিত! কত ভক্তি! কত আগ্রহ! পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া দশ মিনিট ধরিয়া প্রণাম! আসিবামাত্র লুচি মাংস ও রাবড়ির যা-চাই ব্যবস্থা! কিন্তু মনে মনে সারাক্ষণ আমাকে বিপদে ফেলিবার চক্রান্ত! মাস্টারি করিলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, খুব সত্য কথা। অন্য কেহ হইলে কি রতনের ফাঁদে এত সহজে পা দিত, না ডাইনের হাতে পুত সমর্পণের মত সর্বস্ব উহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিত!

'কথামালা'র শৃগালের মত আমাকে কূপে নামাইয়া আমার কাঁধে চড়িয়া রতন তো পলাইল, কিন্তু আমি কি করিয়া উদ্ধার পাইব? তাহার উপর এই মনোরমা! ইহার কি ব্যবস্থা হইবে? একা হইলেও বা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া ওর বাপের বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিতাম। তারপর ওর ভাগ্যে যা আছে তা হইত। কিন্তু ফ্যাসাদ করিয়া বসিয়া আছে যে! তা ছাড়া টাকাই বা পাইব কোথায়? কয়েকটা সোনার বোতাম ও মানিব্যাগে সিকে পাঁচেক পয়সা বালিশের নীচে থাকিয়া রতনের কবল হইতে কোনমতে রেহাই পাইয়াছে বটে, কিন্তু বাহির হইলেই দোকানদার ব্যাটারা ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে। তারপর বাড়িওয়ালা—

মনোরমা এতক্ষণ ফাঁসির আসামীর মত আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত মুখে চাহিয়া ছিল। প্রশ্ন করিল, কি লিখেছে দাদাবাবু? কবে আসবে?

কহিলাম, রতন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আর ফিরে আসবে না।

মনোরমা মিহিস্বরে কাঁদিয়া কহিল, আমি কি করব তা হ'লে? তারপর সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, আমার কথা কিছু লেখে নি? সত্যি বলুন, দাদাবাবু। না হয় চিঠিটা দিন, কাউকে দিয়ে পড়িয়ে আনি—

কহিলাম, লিখেছে, কিন্তু তা শুনে তোমার কাজ নেই মনোরমা, মনে দুঃখ পাবে।

মনোরমা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, কেন?

কহিলাম, তোমাকে আর সে চায় না, শখ মিটে গেছে তার।

মনোরমা বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, সত্যি? কাল পর্যন্ত—

বাধা দিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, তোমাকে সে বিলিয়ে দিতে চায়।

আর্তকণ্ঠে মনোরমা কহিল, বিলিয়ে দিতে চায়? আমি কি ঘটি-বাটি, না ছেঁড়া কাপড়? ছি ছি! মনোরমা উবু হইয়া বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রহিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রতন কি তোমাকে বিয়ে করেছে?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে আর তার ওপর তোমার দাবি কি? একদিন না একদিন তোমাকে ছেড়ে যেতই সে।

মনোরমা মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল, যেন আমিই অপরাধী, কহিল, ভগবান নেই? ধর্ম নেই?

মনে মনে বলিলাম, ভগবান আছেন কি না জানি না, তবে ধর্ম আছেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় রতন আত্মগোপন করিয়াছে।

মনোরমা বলিতে লাগিল, আমার সর্বস্ব ঘুচিয়ে, আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে যে পালাল, কোনও শাস্তি তার হবে না? বলুন আপনি!

আমি কি বলিব? বলিবার আছেই বা কি? কতদিন ধরিয়া কত মনোরমা এই প্রশ্ন করিয়াছে, কোন দিন জবাব পাইয়াছে কি? তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, রতন যদি পুকুরের পাঁক পুকুরেই ধুইয়া ঘরে ফিরিয়া যায় তো কোন দিক হইতে কোন আপত্তি হইবে না, কোন প্রতিবাদ হইবে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে, সমাজ সস্নেহ তিরস্কার করিয়াই তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে, এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল তাহাকে যথোচিত যৌতুকসহ কন্যাদান করিবার জন্য ঝুলাঝুলি করিবে।

মনোরমা গভীর লজ্জায় মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, আমার পেটে যে ছেলে আছে, দাদাবাবু! তার কি উপায় হবে?—বলিয়া আবার মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

মনে মনে বলিলাম, নাবালক অবস্থায় কোন উপায় আছে কি না জানি না, তবে সাবালক হইলে অল-বেঙ্গল গাঁটকাটা অ্যাসোসিয়েশনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু এমনই করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনোরমার দুঃখের ফিরিস্তি শুনিলে কাজ হইবে না। উহার জন্য না হোক, আমার নিজের জন্য রতনের খোঁজ করা দরকার। এখনও যদি শহরে থাকে, তবে পুলিসে খবর দিলে হয়তো সুরাহা হইতে পারে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া এখনই যাওয়া উচিত।

পা বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে মনোরমা মুখ তুলিয়া কহিল, দাদাবাবু, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে! না হ'লে আজ আমার কি হ'ত?

রতন লিখিয়াছে, মনোরমা প্রথমে কান্নাকাটি করিবে, তারপর জড়াইয়া ধরিবে। অতএব সতর্ক হইয়া কহিলাম, আমিই বা কি করতে পারব মনোরমা? তা ছাড়া কাজকর্ম ঘরসংসার ফেলে বেশিদিন থাকতেও পারব না। মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া অবুঝ ছোট মেয়ের মত কহিল, না দাদাবাবু, কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়ব না। কোন উপায় তোমাকে করতেই হবে।

সেইজন্যেই তো যাচ্ছি।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়-ভরা মুখে কহিল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।

ওরে বাবা! পুলিসের কাছে যেতে পারব না; তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরব।—বলিয়া দেওয়ালে-আঁটা একটা তাকের উপর কতক-গুলা শিশির দিকে তাকাইল।

বুঝাইয়া কহিলাম, পুলিস তোমাকে ধরবেও না, মারবেও না। তারা রতনের খোঁজ করবে।

মনোরমা ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, ওকে ধ'রে এনে তো জেলে দেবে? চাই না ওর খোঁজ।

রতনের উপর দরদের মাত্রা দেখিয়া মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কড়া গলায় কহিলাম, রতনের খোঁজ নাই হোক, কিন্তু তোমার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি তো চিরদিন তোমাকে আগলাতে পারব না।

মনোরমা নীরবে করুণ নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাদ-প্রতিবাদ পুনরায় শুরু হইবার পূর্বেই ঘরের বাহির হইয়া যাওয়া সমীচীন ভাবিয়া দুই লাফে চৌকাঠের কাছে আসিতেই

মনোরমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, বেশ, যাও। ফিরে এসে কিন্তু জীয়ন্ত দেখতে পাবে না।

ফিরিয়া মনোরমার দিকে ও তাকের শিশিগুলার দিকে তাকাইলাম। সেখানে কি আছে জানি না, কিন্তু মনোরমার মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

কিন্তু বুড়া বয়সে হাদের মত এই বয়সে রোমান্সে ধরিল নাকি? নতুবা, যাহাকে নিজের স্ত্রী পয়সার লোভে গুণ্ডার হাতে (এখন দেখিতেছি তরুণীর হাতেও) সঁপিয়া দিয়াছে, তাহাকে এক অশ্রুমুখী যুবতী ফিরিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছে, এবং না ফিরিলে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া শাসাইতেছে! অবস্থার নাটকীয়ত্বটিকে চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিবার জন্য ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে একটা মোটা ও কর্কশ কণ্ঠস্বর হাঁক দিল, বাড়িতে কে আছ?

দোকানদার মহাপ্রভুর শুভাগমন হইয়াছে নিশ্চয়! আগাইয়া অভ্যর্থনা করিব, না পিছাইয়া আত্মগোপন করিব, ভাবিতেছি; এমন সময়ে কণ্ঠস্বরের মালিক নিজেই আগাইয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। মোটা কালো বেঁটে; গোঁফ-দাড়িবর্জিত চাকার মত গোল মুখ; মাথার সম্মুখভাগে ঢালাও টাক; গলায় তিন-কণ্ঠি মোটা মালা; গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পেটটি বাহির হইয়া আছে; পায়ে তালতলার চটি; বগলে খেরুয়া বাঁধানো মোটা খাতা। জিজ্ঞাসা করিল, রতন কোথায়?

আমি বাহিরে আসিয়া কহিলাম, রতন বাড়িতে নেই। কথাটা বিশ্বাস করিল না; মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, রোজই তো মিহি মেয়েলী সুরে শুনছি, বাড়ি নেই। আজ আর শুনব না। বেরিয়ে আসতে বলুন।

মনোরমা বাহিরে আসিল না দেখিয়া দে মশায় আমাকে কহিল, তুমিই দাও না হে বাপু। দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ?

দোকানদার মাদুর পাতিয়া দিতেই দে মশায় বসিয়া পড়িয়া দোকানদারকে কহিল, কত টাকা পাবে তুমি, বল দেখি?

দোকানদার হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিল, প্রায় পঁচিশ টাকা।

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দে মশায় কহিল, কি হে বাপু, দিতে পারবে এত টাকা?

আমি কহিলাম, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই, সব রতন নিয়ে পালিয়েছে।

তাই নাকি?—বলিয়া দে মশায় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর হাসির শব্দ উচ্চগ্রাম হইতে নিম্নগ্রামে নামাইয়া গোটাকয়েক গিটকিরি মারিয়া কহিল, রতনটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তা হ'লে! তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, রতন তোমার কে হয়?

এই লোকটার অভদ্র ও উদ্ধত আচরণ মনের গায়ে যেন খোঁচা মারিতেছিল। ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম, কে আবার হয়? কেউ না।

লোকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল, কেউ না! কেউ না তো এখানে মরতে এসেছ কেন? খ'সে পড়।

উত্তর দিলাম, বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি।—বলিয়া যে ঘরে কাল রাত্রে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের দিকে চলিতে উদ্যত হইতেই দোকানদার ব্রস্ত হইয়া কহিল, না দে মশায়। আমার টাকাটার আগে ব্যবস্থা হোক।

দে মশায় কড়া গলায় কহিল, তোমার টাকার আমি ব্যবস্থা করব, ও চ'লে যাক।

এমন সময়ে মনোরমা তার শয়নকক্ষের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আর্তকণ্ঠে কহিল, দাদাবাবু, তুমি যেও না।

মাকড়সার মত মনোরমার দিকে ড্যাবড্যাব করিয়া তাকাইয়া দে মশায় কহিল, গেলই বা! কি ভয় তোমার? আমার বাড়িতে থাকবে তুমি। তোমার সব দেনা আমি নিজে শোধ ক'রে দোব।

আমি সটান ঘরে ঢুকিয়া জামা পরিতে উদ্যত হইলাম। মনোরমা আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিল, কোথায় যাচ্ছ তুমি? তারপর একেবারে পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া কহিল, যেও না দাদাবাবু। তুমি গেলে আমি ঠিক মরব, তুমি দেখো।

এমন সময়ে একটি মেয়েলী স্বর বাহির হইতে উঠান পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান পর্দায় কহিল, কি হয়েছে গা?

মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একজন মেয়েমানুষ; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; পোড়া মাটির মত গায়ের রঙ। মুখের গঠন যৌবনে হয়তো ভালই ছিল, কিন্তু বয়সের আঘাতে ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে; মাথার সিঁথির কাছে টাক পড়িয়াছে; নাকে প্রকাণ্ড নথ ও প্রত্যেক কানে ডজন খানেক ছোট বড় মাকড়ি। পরিধানে ন-হাতি লালপাড় শাড়ি। দেখিয়া মনে হইতেছে যে, নেহাৎ দর্শকবৃন্দের লজ্জানিবারণের জন্যই অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়াছেন, নচেৎ তাঁহার নিজের ওসব বালাই নাই। আমাকে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই দেখিলাম, কালো ঠোঁটের উপর সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা। মেয়েমানুষটা আমার দিকে কতক্ষণ প্যাটপ্যাট করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গা বউ?

মনোরমা আমার দিক হইতে স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরিয়া বসিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, ও কোথায় চ'লে গেছে দিদি।

গালে হাত দিয়া দিদি কহিল, রতনা পালিয়েছে? ওঃ, তাই বুঝি

আমাদের মিন্সে এখানে আসর জমাতে এসেছে? মজাটা দেখাচ্ছি একবার।—বলিয়া বাহিরে গিয়া হাঁক দিয়া দে মশায়কে কহিল, অ্যাই মিন্সে, এখানে কি হচ্ছে?

দে মশায় তেমনই ভাবে জবাব দিল, কি আবার হবে? রতনার পাওনাদার টাকার জন্যে এসেছে, তার ব্যবস্থা করতে হবে না?

স্ত্রীলোকটি দে মশায়ের জীবনসঙ্গিনী নিশ্চয়ই। নচেৎ এমন মধুর সম্ভাষণ পৃথিবীতে আর কোন স্ত্রীলোকের কাছে পাওয়া সম্ভব কি? দে-গিন্নী মুখ ভেঙচাইয়া কহিল, পাওনাদার ওর ব্যাই কিনা, তাই তার জন্যে মাথা টনটন করছে! যাও এখান থেকে।

দে মশায় দোকানদারের দিকে তাকাইয়া কহিল, তোমার টাকার তা হ'লে আমি কিছু জানি না মল্লিকের পো, ব'লে দিলুম আমি।

মল্লিকের পো জবাব দিতে না দিতেই দে-গিন্নী জবাব দিল, মল্লিকের পোকে কিছু বলতে হবে না। তুমি যাও দিকি। যাও।—বলিয়া দরজার দিকে হাত বাড়াইল। সার্কাসে খেলোয়াড়ের চাবুকের ইঙ্গিতে হিংস্র জানোয়ারের মত দে মশায় সুড়সুড় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মল্লিকের পো মুখখানি মলিন করিয়া দে-গিন্নীকে কহিল গিন্নীমা, আমার ব্যবস্থা তা হ'লে কি হবে?

তাহাকে ধমকাইয়া দে-গিন্নী কহিল, তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে বাপু। তুমি ব'স।—বলিয়া ঘরে আসিতেই মনোরমা কান্নার সুরে কহিল, আমার কি হবে দিদি?

কি আর হবে! দুদিন সবুর কর্, রতনা আসে ভালই, না হয়—। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, এ লোকটিকে তো চিনতে পারলুম না বউ?

মনোরমা কহিল, উনি আমার দাদাবাবু।

বিস্মিত কণ্ঠে দে-গিন্নী কহিল, তোমার নিজের দাদা?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, গাঁয়ের সম্পর্কে দাদা।

ওঃ, তাই।—বলিয়া দে-গিন্নী যে কি সিদ্ধান্ত করিল, তা সেই জানে। তারপর আমাকে কহিল, তা বাপু, মনোরমার যখন তুমি আপনার লোক, তখন তোমারই তো সব ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি জবাব দিলাম, আমি কি করব? আমার টাকাকড়ি যা ছিল রতন নিয়ে পালিয়েছে।

তাই নাকি? তা আর কিছু নেই সঙ্গে?—তারপর আমার সোনার বোতামগুলার দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, ওই যে সোনার বোতাম রয়েছে, দাও দিকি ওগুনো। আমি একটু ইতস্তত করিতেছিলাম। কারণ সোনার বোতামগুলিই আমার শেষ সম্বল। বাসনা ছিল, ওইগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু কাপড়চোপড় ও বাড়ি ফিরিবার খরচ সংগ্রহ করিব।

কিন্তু দে-গিন্নী একেবারে সাংঘাতিকভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দাও বাপু, দাও। চোখের সামনে এই বিপদ দেখে কি ক'রে যে সোনার বোতাম প'রে ফোতোমি করছ, তাই দেখে আশ্চয্যি হচ্ছি। দে-গিন্নীর ভাব দেখিয়া মনে হইল, নিজে না খুলিয়া দিলে সেই জোর করিয়া খুলিয়া লইবে।

বোতামগুলি জামা হইতে খুলিবামাত্র দে-গিন্নী ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল। তারপর বাহিরে গিয়া দোকানদারকে কহিল, এস আমার সঙ্গে, তোমার টাকা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।—বলিয়া দুইজনেই বাহির হইয়া গেল।

সভয়ে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা দেবে তো?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া অভয় দিল।

দেনা শোধ হয়েও যদি কিছু বাঁচে, তা বোধ হয় আর দেবে না, নয়?

মনোরমার জবাব মিলিল না।

সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, যাক, ভালই হ'ল, তোমার দেনা শেষ হয়ে গেল। এর পর বোধ হয় আমার যাওয়াতে তোমার আপত্তি হবে না, না মনোরমা?

মনোরমা উদাস দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য আমার উপর রাখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বল, যাব?

মনোরমা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, যান।

তা ভাল। মনে করিয়াছিলাম, মনোরমা আবার কাঁদিয়া উঠিবে, আবার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিবে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমাকে যাইতে বলিয়া মনোরমা আমাকে নিরাশ করিল। ইহার পর যাইব, না থাকিব, তা ঠিক করিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যি বলছ তো? মনোরমা দুই চক্ষের দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে আমার উপরে রাখিয়া কহিল, কি আর বলব, বলুন? পায়ে ধরলুম, কাঁদলুম, আপনি গেলে মরণ ছাড়া আমার গতি নেই জানালুম, তাতেও আপনার মন পেলুম না। আমি পর, তাই বোধ হয় এমনই ক'রে ফেলে যেতে আপনার বাধছে না, নিজের লোক হ'লে হয়তো একটু মায়া হ'ত।

ফিরিয়া কাছে গিয়া কহিলাম, কি করব মনোরমা! তোমার যে কি ব্যবস্থা করব, আমি বুঝতে পারছি না।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মনোরমা কহিল, বলছি তো, ও ঘরে শিশিতে মালিশ আছে, এনে দিন, খেয়ে আমি মরি, তারপর আপনি নিশ্চিন্ত

হয়ে যেখানে ইচ্ছে যান।—বলিতেই মনোরমার দুই চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সর্ব্বনাশ! মনোরমার যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে যে কোন সময়ে বিষ খাইয়া মরিয়া হাতে দড়ি পরাইয়া দিতে পারে। অতএব শিশিটা সরাইয়া ফেলা উচিত। মনোরমার শোবার ঘরে গিয়া তাকের উপরে মালিশের শিশি আবিষ্কার করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে মালিশের গন্ধ ছাড়া এক বিন্দুও মালিশ নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, দে-গিন্নী আসিয়া মৃদুকণ্ঠে মনোরমার সহিত আলাপ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, দোকানদার মিন্সের দেনা মিটিয়ে দিয়ে এলুম। তা ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাপু, না হ'লে বড় ফ্যাসাদ হ'ত। তাই বলছিলুম ছুঁড়ীকে, অনেক পুণ্যের ফলে পেয়েছিস, ছাড়িস্ নি। তা তোমাকেও বলি বাপু, মনোরমার মত মেয়ে এমন কিছু ফেলনা নয়। এখন কেঁদে-কেটে অমন ঝ'ড়ো কাকের মত চেহারা করেছে তাই, নইলে ভাল ক'রে চুল বেঁধে, মুখ মুছিয়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়ে যদি সামনে দাঁড় করিয়ে দিই তো মুনির মন ট'লে যাবে—

বাধা দিয়া কহিলাম, দেখুন, পুলিসে একটা খবর দিলে হয় না?

কড়ির মত সাদা চোখ ঘুরাইয়া দে-গিন্নী কহিল, পুলিস কি হবে?

কহিলাম, রতনের একটা খোঁজ করাও তো দরকার।

মনোরমার দিকে তাকাইয়া দে-গিন্নী কহিল, হ্যাঁ বউ, সে ছোঁড়ার আর কি দরকার?

মনোরমা কি বলিল, কি করিল, শুনিতে বা দেখিতে পাইলাম না।

দে-গিন্নী কহিল, তা ছাড়া ফিরে এলেও তাকে আর এ বাড়িতে উঠতে দিচ্ছি না। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমি ভদ্দরনোকের ছেলে, তোমাকে থাকতে দিতে আপত্তি নেই।

দেনা শোধ হয়েও যদি কিছু বাঁচে, তা বোধ হয় আর দেবে না, নয় ?

মনোরমার জবাব মিলিল না।

সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, যাক, ভালই হ'ল, তোমার দেনা শেষ হয়ে গেল। এর পর বোধ হয় আমার যাওয়াতে তোমার আপত্তি হবে না, না মনোরমা ?

মনোরমা উদাস দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার উপর রাখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বল, যাব ?

মনোরমা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, যান।

তা ভাল। মনে করিয়াছিলাম, মনোরমা আবার কাঁদিয়া উঠিবে, আবার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিবে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমাকে যাইতে বলিয়া মনোরমা আমাকে নিরাশ করিল। ইহার পর যাইব, না থাকিব, তা ঠিক করিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যি বলছ তো ? মনোরমা দুই চক্ষের দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে আমার উপরে রাখিয়া কহিল, কি আর বলব, বলুন ? পায়ে ধরলুম, কাঁদলুম, আপনি গেলে মরণ ছাড়া আমার গতি নেই জানালুম, তাতেও আপনার মন পেলুম না। আমি পর, তাই বোধ হয় এমনই ক'রে ফেলে যেতে আপনার বাধছে না, নিজের লোক হ'লে হয়তো একটু মায়া হ'ত।

ফিরিয়া কাছে গিয়া কহিলাম, কি করব মনোরমা! তোমার যে কি ব্যবস্থা করব, আমি বুঝতে পারছি না।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মনোরমা কহিল, বলছি তো, ও ঘরে শিশিতে মালিশ আছে, এনে দিন, খেয়ে আমি মরি, তারপর আপনি নিশ্চিন্ত

হয়ে যেখানে ইচ্ছে যান।—বলিতেই মনোরমার দুই চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সর্ব্বনাশ! মনোরমার যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে যে কোন সময়ে বিষ খাইয়া মরিয়া হাতে দড়ি পরাইয়া দিতে পারে। অতএব শিশিটা সরাইয়া ফেলা উচিত। মনোরমার শোবার ঘরে গিয়া তাকের উপরে মালিশের শিশি আবিষ্কার করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে মালিশের গন্ধ ছাড়া এক বিন্দুও মালিশ নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, দে-গিন্নী আসিয়া মৃদুকণ্ঠে মনোরমার সহিত আলাপ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, দোকানদার মিন্সের দেনা মিটিয়ে দিয়ে এলুম। তা ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাপু, না হ'লে বড় ফ্যাসাদ হ'ত। তাই বলছিলুম ছুঁড়ীকে, অনেক পুণ্যের ফলে পেয়েছিস, ছাড়িস নি। তা তোমাকেও বলি বাপু, মনোরমার মত মেয়ে এমন কিছু ফেলনা নয়। এখন কেঁদে-কেটে অমন ঝ'ড়ো কাকের মত চেহারা করেছে তাই, নইলে ভাল ক'রে চুল বেঁধে, মুখ মুছিয়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়ে যদি সামনে দাঁড় করিয়ে দিই তো মুনির মন ট'লে যাবে—

বাধা দিয়া কহিলাম, দেখুন, পুলিসে একটা খবর দিলে হয় না?

কড়ির মত সাদা চোখ ঘুরাইয়া দে-গিন্নী কহিল, পুলিস কি হবে?

কহিলাম, রতনের একটা খোঁজ করাও তো দরকার।

মনোরমার দিকে তাকাইয়া দে-গিন্নী কহিল, হ্যাঁ বউ, সে ছোঁড়ার আর কি দরকার?

মনোরমা কি বলিল, কি করিল, শুনিতে বা দেখিতে পাইলাম না।

দে-গিন্নী কহিল, তা ছাড়া ফিরে এলেও তাকে আর এ বাড়িতে উঠতে দিচ্ছি না। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমি ভদ্দরনোকের ছেলে, তোমাকে থাকতে দিতে আপত্তি নেই।

কহিলাম, আমি থাকব কি ক'রে? আমার ঘরসংসার নেই?

কালো মাড়ি সুদ্ধ পান ও দোক্তার ছোপ-লাগা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া দে-গিন্নী কহিল, থাকলেই বা ঘরসংসার, তা ব'লে কাছিমের মত সারাক্ষণ পিঠে ব'য়ে বেড়াতে হবে নাকি? ঘরসংসার দেশে থাক্, তুমি এখানে একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় ক'রে নিয়ে থাক। ঘরসংসারও থাকল, বার-সংসারও থাকল। এমন আমি ঢের দেখেছি বাপু, এতে কিছু দোষ নেই।

মনোরমা এসব কথা শুনিয়া কি ভাবিতেছে কে জানে! হয়তো ভাবিতেছে, আমি সায় দিতেছি। প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, কি যা-তা বলছেন? মনোরমা আমার বোনের মত।

গাঁয়ের সম্পর্কে বোন তো?

দেখুন, ওসব কথা থাক, রতনকে একবার খোঁজ করতেই হবে। আমার অনেক টাকা সে নিয়ে পালিয়েছে। এখনও তাকে পাওয়া গেলে কিছু টাকা উদ্ধার হতে পারে। তাতে আপনার বাড়িভাড়ার কতকটা শোধ হবে হয়তো। যুক্তিটা এবার দে-গিন্নীর মনে লাগিল। কহিল, তাই নাকি? এখুনি আমি পুলিসে খবর দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু রতনকে না পাওয়া গেলে তোমাকেই বাপু সব ভার নিতে হবে।

আমি কি করতে পারব ওর?

সে তুমিই জান। পছন্দ হয় এখানে থাকবে, না হয় সঙ্গে ক'রে দেশে নিয়ে যাবে। মোদ্দা আমি আর এখানে রাখতে পারব না। এমনিই আমার অনেক নোকসান হয়ে গেছে।

আপনার বাড়িতেই ওকে রাখুন না, আপনার মেয়ের মত থাকবে, কাজকর্ম করবে, তারপর রতন যদি কোন দিন ফিরে আসে—

বাধা দিয়া দে-গিন্নী কহিল, না না, ওসব কথা ব'লো না। আমার

পুরুষমানুষের ঘর, ওই আগুনের খাপরার মত মেয়েকে আমি ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না। তুমিই ওকে নিয়ে যাও; খরচপত্তর যা লাগবে, বরং আমি দোব।

মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখ্, আর কান্নাকাটি করিস নি। চান-টান ক'রে রাঁধা-বাড়া খাওয়া-দাওয়া কর্। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কি গো বাবু, মনোরমার হাতে খাবে তো? তারপর নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল, খাবে বইকি। বামুনই হোক আর ভটচাষ্যিই হোক, সুন্দরী মেয়ের হাতের রান্না না খেতে আজও কাউকে দেখলুম না। মনোরমার উদ্দেশে কহিল, আমি এখনকার মত চললুম বউ। আবার আসব ওবেলা, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিবি আয়।

খাওয়ার পরে রতনের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, রতনের বিছানায় ফরসা চাদর পাতিয়া মনোরমা আমার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছে। বিনা আপত্তিতে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, দোকানদার মিথ্যা বলে নাই। রতনের গদি তো দখল করিয়াই বসিয়াছি। রতনের আসনে বসিয়া, রতনের থালায়, রতনের মনোরমার হাতের রান্না খাইয়া, রতনের বিছানায়, মনোরমার রচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছি। ইহার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, পান ও দোক্তার রসে ওষ্ঠাধর লাল টুকটুকে করিয়া, একপিঠ কালো চুলের উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া মনোরমা যদি আমার পা টিপিতে বা মাথায় হাত বুলাইতে অথবা বক্ষের অতি সন্নিকটে বসিয়া সংসার-খরচের ফিরিস্তি দিতে বসে, আশ্চর্য হইব না। কারণ রতনের বিরহ মনোরমাকে বিশেষ কাবু করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। মনোরমা যে কান্নাকাটি করিতেছে, তাহা রতনের জন্য নহে, নিজের আশ্রয়হীনতার জন্য। আবার আশ্রয় জুটিলে, বৃক্ষচ্যুত লতা যেমন পুরাতন বৃক্ষকে ভুলিয়া

নূতন বৃক্ষকে অবলীলাক্রমে জড়াইয়া ধরে, তেমনই করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে।

রাত্রে ঘুম হয় নাই। ‘পীরিত ও পয়জার’ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কাহার ঠেলা খাইয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, মনোরমা তুই চোখ ভয়ে ডাগর করিয়া চাপাস্বরে কহিতেছে, দাদাবাবু, পুলিস এসেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বারান্দায় মাদুরের উপর দারোগাবাবু বসিয়া আছেন। সামনে দে মশায় গলবস্ত্র ও যুক্তকর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং অদূরে তুইজন কন্‌স্টেব্‌ল ও তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলা লোক দাঁড়াইয়া আছে। দারোগাবাবুকে দেখিয়া চেনা লোক বলিয়া মনে হইল। কোথায় কখন তাহাকে দেখিয়াছি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দারোগাবাবু দয়া করিয়া নিজেই চিনিয়া কহিলেন, আপনি এখানে থাকেন? আমাকে চিনতে পারছেন না?

অপ্রতিভভাবে ঘাড় নাড়িলাম। দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, সেই যে সিটি কলেজে একসঙ্গে পড়তাম,—আবতুল গফর।

মনে পড়িল। একসঙ্গে আই. এ. ক্লাসে পড়িয়াছিলাম। পূর্ববঙ্গে কোথায় বাড়ি। মেসে আমার কাছে প্রায়ই আসিত।

চিনতে পেরেছি।—বলিয়া দে মশায় ও দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দারোগাবাবুর কাছে গিয়া বসিলাম।

গফর জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার বলুন দেখি?

সমস্ত বুঝাইয়া বলিতেই গফর কহিল, ওই মেয়েটিই তবে রতনের—

জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

ওকে একবার ডাকুন, গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞেস করি।

মনোরমাকে ডাকিয়া আনিলাম। কিন্তু গফর মনোরমাকে প্রশ্ন করিবে কি, হ্যাংলা কুকুর খাবারের ঠোঙার দিকে যেমন করিয়া তাকাইয়া থাকে, তেমনই ভাবে মনোরমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধ্যানস্থ হইয়া গেল। ঠেলা দিয়া কহিলাম, কি জিজ্ঞেস করবেন বলছিলেন যে?

সম্বিৎ লাভ করিয়া গফর অপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে।

তদন্ত শেষ করিয়া গফর বলিল, আসুন না, বাড়িতে ব'সে থেকে কি করবেন?

মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, যেতে পারলেই তো বাঁচি, কিন্তু ওকে একলা রেখে যাই কি ক'রে? মনোরমা যে আমাকে চোখের আড়াল করিতে চাহিবে না, সে কথাটা চাপিয়া গেলাম।

মুচকি হাসিয়া গফর কহিল, আচ্ছা কাজ জুটিয়েছেন, কিন্তু কতদিন পাহারা দেবেন ওকে?

যতদিন না রতন ফেরে।

সে কি আর ফিরবে ভেবেছেন? তার ওপর যখন আবার চুরি ক'রে পালিয়েছে।

নিজে থেকে ফিরবে না বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন না?

পারব না—আমরা কি কখনও বলি? তবে আপনি বন্ধুলোক, আপনাকে ঠকানোটা ভাল দেখায় না। কথাটা কি জানেন, কলকাতা শহরে যদি কেউ গা-ঢাকা দিতে চায় তো পুলিসের পিতৃপুরুষেরও সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বের করে।

ডাক্তার রোগ অসাধ্য বললে আর উপায় কি?

এখনই অবশ্য হাল ছাড়তে বলছি না, আমরা চেষ্টা ক'রে দেখি।

আচ্ছা, আজ আসি। আপনি ব'সে ব'সে পাহারা দিন। আবার দেখা হবে।

দারোগা যাইতেই মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, দারোগাবাবু কি বললেন?

বললেন, রতনকে খুঁজে বের করবেন।

মনোরমা বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, খুঁজে আনলে আর আমার কি হবে? ওকে তো আবার চুরির দায়ে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জেলে দেবে।

তোমার চিন্তা নেই। দারোগা আমার বন্ধুলোক। বললেই রতনকে ছেড়ে দেবে।

রাত্রে আহার সারিয়া মনোরমাকে কহিলাম, আমার তা হ'লে ওই ঘরে বিছানাটা ক'রে দাও।—বলিয়া যে ঘরে কাল রাত্রে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলাম। মনোরমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না, আমার শোবার ঘরে বিছানা ক'রে দিয়েছি।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, তা হ'লে তুমি শোবে কোথায়?

অবলীলাক্রমে মনোরমা কহিল, ওই ঘরেই।

সভয়ে কহিলাম, তুমি কি পাগল হয়েছ মনোরমা?

মনোরমা মুচকি হাসিয়া জবাব দিল, পাগল হই নি ব'লেই তো এই ব্যবস্থা করেছি। কাল রাত্রে একজন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, আজ যদি আপনি পালিয়ে যান?

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মনোরমা, তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা না ক'রে আমি যাব না।

না দাদাবাবু, কারুর ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। যাকে বিশ্বাস ক'রে বাপ-মার আশ্রয় ছেড়েছিলাম, সেই ছেড়ে যেতে পারলে, আর আপনি পারবেন না? দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, যান, আপনি ওই ঘরেই

শোন্‌গে। আমার শোবার কথা ভাবছেন? আমি শোব না, সারারাত্রি জেগে ব'সে থেকে আপনাকে পাহারা দোব।

এমনই করিয়া দুই দিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা মনোরমা, যদি রতনকে না পাওয়া যায়, তা হ'লে কি করবে ভাবছ?

কোন যন্ত্রের একটা স্ক্রু খুলিয়া পড়িয়া গেলে লোকে যেমন আর একটি নূতন স্ক্রু বসাইয়া আবার যন্ত্রটিকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া লয়, পুরাতনটার জন্য কোন দুঃখ বোধ করে না, নূতনটার উপরেও বিশেষ মনোযোগ দেয় না, মনোরমাও তেমনই রতনের জায়গায় আমাকে বসাইয়া লইয়া সংসারযন্ত্র আবার সহজভাবে চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি যে তাহার জীবনে একজন আগন্তুক, এ কথাটাকে সে আমল দিতেছে না। কাজেই আমার প্রশ্নের উত্তরে, অনেকদিন একসঙ্গে ঘরসংসার করিতে করিতে গৃহস্থালী-সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা স্বামীকে যেমন ভাবে জবাব দেয়, মনোরমা তেমনই ভাবে কহিল, তুমি যা বলবে।

কলকাতায় শুনেছি মেয়েদের জন্যে অনেক আশ্রম আছে, সেখানে যেতে ইচ্ছে করে?

মনোরমা নতমুখে কাজ করিতে করিতেই জবাব দেয়, আশ্রমে-টাশ্রমে আমি যেতে পারব না। তারপর মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, কারা থাকে সেখানে?

আরও অনেক মেয়ে থাকে। কত রকম কাজ শিখবে সেখানে, লেখাপড়া শিখবে, ভবিষ্যতে নিজে রোজগার করতে পারবে।

মনোরমা কি বুঝিল কে জানে, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, আমি কোথাও যেতে চাই না।

আর এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, মনোরমা, আশ্রমে না হয় নাই গেলে, কিন্তু কোন ভদ্রলোক যদি তোমাকে আশ্রয় দেয়, তোমাকে আদর-যত্ন ক'রে রাখে, তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?

মনোরমা প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ভদ্রলোক? আপনি নিজে বুঝি?

তাড়াতাড়ি কহিলাম, না না, আমি নয়, এমনিই বলছি।

চাপা হাসিয়া দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া মনোরমা কহিল, এমনিই? আমি কিছু বুঝি না?

দিন চার পরে একদিন সকালে বাহিরের দরজায় হাঁকাহাঁকি শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একজন কন্‌স্টেব্‌ল দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিতেই লোকটা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কহিল, বাবু, জেনানা-লোককো লিয়ে তুমাকে আভি দেখা কোরতে বলিয়েসে।

আমিও যথাসাধ্য বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় উত্তর দিলাম, রতনকে কি খুঁজকে পায়া হ্যায়?

কন্‌স্টেব্‌ল প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, জরুর।

মনোরমাকে লইয়া থানায় হাজির হইলাম। গফর তাহার অফিসে বসিয়া কি লিখিতেছিল। আমাকে দেখিয়া কহিল, ওঃ, এসেছেন। বসুন।—বলিয়া চেয়ার দেখাইয়া দিল। কন্‌স্টেব্‌লকে কহিল, ওই ঘরে ওকে বসাওগে।—বলিয়া আবার লিখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, রতনকে কি পাওয়া গেছে?

গফর লিখিতে লিখিতেই কহিল, বলছি।

জরুরি লেখাপড়া শেষ করিয়া গফর কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া চেয়ার ঘুরাইয়া মুখামুখি হইয়া বসিয়া কহিল, রতনকে পাওয়া যায় নি।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, পাওয়া যায় নি? তবে—

বাধা দিয়া গফুর কহিল, না, পাওয়া যায় নি। অনেক খোঁজ করা হয়েছে। কলকাতায় সে নেই।

হতাশ কণ্ঠে কহিলাম, তা হ'লে আমাদের ডেকে আনবার কারণ?

গফুর বলিল, বলছি। তারপর একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, মেয়েটির কি ব্যবস্থা করবেন? চিন্তিত মুখে কহিলাম, কি যে করব কিছু স্থির করতে পারছি না। কোনও আশ্রমে পাঠিয়ে দিলে হয় না?

মেয়েটি আশ্রমে যেতে চায় কি না, জিজ্ঞেস ক'রে দেখেছেন?

জিজ্ঞেস করেছি, যেতে চায় না।

তবুও জোর ক'রে পাঠিয়ে দেবেন?

বিব্রতভাবে কহিলাম, কি করব তবে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, তা হ'লে দেশে নিয়ে গিয়ে ওর বাপ-মার কাছে ফেলে দিইগে, তারপর যা ওর অদৃষ্টে আছে হবে।

কি যে হবে, তা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। বাপ-মা আত্মীয় স্বজন কেউ ওকে ঠাঁই দেবে না; এঁটো পাতার মত সমাজের আঁস্তাকুড়ে ও পাবে আশ্রয়। সেখানে আবর্জনার মধ্যে থেকে পুরুষের লালসার রসদ যোগাতে যোগাতে ওর দেহ ও মন উঠবে বিষিয়ে, তারপর ঘেয়ো কুকুরের মত আঁস্তাকুড়ের পাশেই ও একদিন মরবে।

গফুর মিথ্যা বলে নাই। ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম, সৌরভী নামে একটা বুড়ী আমাদের গাঁয়ে ভিক্ষা করিতে আসিত। শুনিয়াছিলাম, যৌবনে সে নাকি অপরূপা রূপসী ছিল। দেশের জমিদার ও ধনীরা কুকুরের মত তাহার পিছু পিছু ফিরিত। তাহার একটু হাসি, একটু আদর কিনিবার জন্য লোকে ঘটিবাটি বেচিয়া, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া অর্থসংগ্রহ করিত এবং অর্থ না জুটিলে আত্মহত্যা করিত। তারপর একদিন সুখ-স্বপ্নের মত সৌরভীর যৌবন মিলাইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে

মিলাইয়া গেল প্রণয়ী ও ক্রেতার দল, দাসদাসী, ধন ও ঐশ্বর্য। শেষে দ্বারে দ্বারে লোকের শ্লেষের হাসির খোরাক যোগাইয়া সে ভিক্ষা করিত, গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা ঘরে থাকিত। তারপর শ্রাবণ মাসের এক ঝড়বাদলের রাত্রে দেওয়াল চাপা পড়িয়া সৌরভী মরিয়া বাঁচিল, এবং গ্রামের ডোমেরা শবটা টানিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া দিয়া শেয়াল-কুকুরের ভোজের ব্যবস্থা করিল।

চিন্তিত মুখে কহিলাম, তা হ'লে কি করব, আপনিই বলুন?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গফর কহিল, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। আপনি আমার পুরনো বন্ধু ব'লেই বলতে সাহস করছি। আমি মনোরমাকে শাদি করতে চাই।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, সে কি! মনোরমা—

গফর কহিল, হিন্দু, তা আমি জানি। কিন্তু সমাজের আশ্রয় হারিয়ে শুধু ধর্ম নিয়ে কি ওর চলবে?

প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিলাম, কিন্তু মনোরমা—

মনোরমার দৈহিক অবস্থা খুলিয়া বলিলাম।

গফর কহিল, এইজন্যেই আরও জোর ক'রে আমি আমার প্রস্তাব করছি।

নীরব রহিলাম। গফর বলিতে লাগিল, ওর এখন সকলের চেয়ে বেশি দরকার, নিজের আর ছেলের জন্যে সমাজে আশ্রয় ও মর্যাদা; এই দুইই সে আমার কাছে পাবে, কিন্তু—

বাধা দিয়া কহিলাম, আপনার তো স্ত্রী আছেন?

আছেন, কিন্তু তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি হবে না। একাধিক বিবাহ আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে।

বাংলা দেশে মুসলমান-সমাজের পুরুষদের ধর্মনিষ্ঠার ধাক্কায় আমরা,

হিন্দুরা তো সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের ধর্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমাদের শাস্ত্রেও ব্যবস্থার অভাব নাই; কিন্তু আমাদের স্ত্রীগুলি? শাস্ত্রবাক্য পালন করিবার নাম করিলেই শস্ত্রপাণি হইয়া উঠে।

কহিলাম, বেশ, তাঁর না আপত্তি হোক, আর একজনের আপত্তি হবে।

সন্দিগ্ধ স্বরে গফর কহিল, কার? আপনার নাকি?

না না, আমার নয়, দে মশায়ের।

ওর আপত্তি হবে কেন?

ওর অনেক টাকা পাওনা আছে রতনের কাছে।

সেজন্যে আপনি ভাববেন না। প্রথমত, পুলিসের লোককে ও চটাতে সাহস করবে না; দ্বিতীয়ত, আমি রতনের ধার শোধ ক'রে দোব। এমন কি, বলেন তো আপনার টাকাও মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।

লোকটা যেরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাধা দিয়া কোন ফল হইবে না বুঝিলাম; তবুও কহিলাম, আপনি যে ওকে বিবাহ করবেন, তার প্রমাণ কি?

আপনি নিজের চোখে দেখে যাবেন।

না না, আমি ওর মধ্যে থাকতে চাই না।

বেশ, আমি প্রমাণ পাঠিয়ে দোব।

কিন্তু মনোরমা রাজি হইবে কি? কে জানে? হয়তো প্রথমে কান্নাকাটি করিবে, শেষে নিরুপায় হইয়া রাজি হইবে, এবং আমি যে তাহাকে কাপুরুষের মত নিরাশ্রয় ও নিরাত্মীয় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, এইজন্য চিরজীবন আমাকে ধিক্কার দিবে। কিন্তু

তাহাকে কোন দিক হইতে কোন বিষয়ে সাহায্য করিবার আমার সাধ্য আছে কি? ধর্ম ও সমাজের মুখের পানে তাকাইয়া সমর্থনের সঙ্কেতটুকু পর্যন্ত পাইতেছি না। তাহার চেয়ে গফরের আশ্রয়ে রাখিয়া যাওয়াই মনোরমার পক্ষে মঙ্গল। এখানে মনোরমা মর্যাদা পাইবে, হয়তো স্নেহ ও ভালবাসা পাইবে, এবং যে আশা তাহাকে সমাজ ও সংসার হইতে টানিয়া বাহিরে আনিয়াছে, তাহাও একদিন হয়তো সার্থক হইয়া উঠিবে।

কহিলাম, আমাকে তা হ'লে কি করতে হবে?

গফর কহিল, কি আর করবেন? বাড়ি চ'লে যান, আমি টাকা দিচ্ছি।

দান আমি চাই না, ধার হিসেবে কিছু দিন। বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দোব।

দেশে ফিরিয়া আসিলাম। চাকুরি হয় নাই। সাবিত্রী কবচটি আসিবার সময়ে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি। বলা বাহুল্য, রতন ও মনোরমা সংক্রান্ত কোন কথা স্ত্রীকে জানাইলাম না। সুটকেস ও টাকার অন্তর্ধানের কারণ নির্দেশ করিয়া কহিলাম, যাবার সময় ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, চোরে চুরি করেছে।

স্ত্রী গালে হাত দিয়া বিস্ময় ও ক্ষোভ সূচক মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতগুলো টাকা চোরের হাতে তুলে দিলে! এমন ঘুমের মুখে আগুন লাগে না! তারপর আমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থের হাতে সারাজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে সমর্পণ করার জন্য পরলোকগত পিতামাতার উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দিন দশ পরে হিন্দু পত্রিকায় জনৈকা হিন্দুনারীর ধর্মত্যাগ প্রসঙ্গে একটি সংবাদ বাহির হইল—

"মনোরমা নামে একটি হিন্দু বিধবা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নূতন নাম মেহেরুন্নিসা বিবি। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়াছে।" অতঃপর সম্পাদক ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু-সমাজের জন্য যথারীতি মনস্তাপ করিয়াছেন এবং বিধবাবিবাহ-আন্দোলন আরও সবেগে চালাইবার জন্য সমাজের নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিয়াছেন।

তার পরদিন একখণ্ড 'মুসলমান' পাইলাম, বোধ হয় গফর পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাতে মনোরমা সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত বিবরণ, তাহার ধর্ম-ত্যাগ ও বিবাহের সংবাদ, আবদুল গফর ছাহেবের সমাজ ও ধর্ম প্রীতির প্রচুর প্রশংসা, এবং মুসলমান যুবকবৃন্দকে গফর ছাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুরোধ বাহির হইয়াছে।

* * *

মনোরমা মেহেরুন্নিসা বনিলেও কোন দিন তাহাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব কি না কে জানে!

ন্যাড়া

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিন কয়েক আগে গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হইয়াছে। রাত্রি বারোটা। বসিয়া বসিয়া প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলাম এবং মনে মনে ছাত্রদের মুণ্ডপাত করিতেছিলাম। অদূরে খাটের উপর পত্নী গরমে ছটফট করিতেছিলেন এবং এই পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রকাশ্যে আমাকে ও, পুত্রকন্যা-সমেত পত্নীকে দার্জিলিং পাঠাইতে সমর্থ কোন বড় সরকারী চাকুরের সহিত বিবাহ না হওয়ার জন্য, স্বগত নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, কে মিহিস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। কান খাড়া করিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, মেয়েমানুষের কান্না—কোথায় গেলি রে বাপ আমার, একবার দেখা দে বাবা! এই দুপুর-রাত্রে অসহ্য গরমে কাহার আবার কান্নার শখ হইয়াছে! হঠাৎ মনে হইল, পেত্নী নয় তো? পাড়াগাঁয়ে ইহাদের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। গাটা ছমছম করিতে লাগিল। হাঁকিয়া কহিলাম, ওগো, শুনছ? কোনও জবাব মিলিল না। ঘুমাইয়া পড়িল নাকি? আরও একটু জোরে ডাকিলাম, ওগো!

ঝঙ্কার হইল, কেন? কি করতে হবে, কি?

সভয়ে কহিলাম, কিছু না। শুনতে পাচ্ছ?

কি?

কে কাঁদছে!

পত্নী ধমকাইয়া কহিলেন, কে আবার? জান না নাকি? ন্যাড়ার মা। পত্নী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রোজই তো কাঁদে, শোন নি কোন দিন? জবাব দিলাম না, কিন্তু ন্যাড়াকে মনে পড়িল।

ন্যাড়া আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মহেশ আচায্যির ছেলে। মহেশ কয়লা-খাদে চাকুরি করিতেন, এবং চাকুরি করিতে করিতেই পাথর চাপা পড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধবা পত্নীর জন্য পর্যাপ্ত স্মৃতি ও প্রচুর পৈতৃক ঋণ, একটি তেরো বছরের বিবাহযোগ্যা কালো মেয়ে এবং দশ বৎসরের একটি নাবালক ছেলে ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই স্বামীর জন্য কান্নাকাটি শেষ করিতে না করিতেই বিধবা দয়াময়ীকে পাওনাদারদের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইল। জমিজমা, পুকুর, বাগান,—যাহা কিছু ছিল, দেনার দায়ে সব গেল, রহিল শুধু ভিটাটুকু অর্থাৎ মাটির একটি কোঠা ও খান দুই চালা-ঘর। দয়াময়ীর বাবা কোন এক জেলা-শহরের স্কুলে পণ্ডিতি করিতেন। সংবাদ পাইয়া মেয়েকে দেখিতে আসিলেন; শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিয়া শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন; বাছা বাছা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া দয়াময়ীর দুর্ভাগ্যকে তাহার পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়া প্রমাণ করিলেন; কিন্তু কেমন করিয়া ইহার পর দয়াময়ীর দিন চলিবে, মেয়ের বিবাহ হইবে ও ছেলে মানুষ হইবে, তাহার কিছুই হদিস দিতে পারিলেন না। অবশ্য পণ্ডিতকে দোষ দেওয়াও যায় না—কারণ সর্বস্ব ঘুচাইয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া তারপর পুত্রকন্যা সমেত সেই মেয়ের ভার ঘাড়ে লওয়া কোন মধ্যবিত্ত বাঙালী পিতার সাধ্য নয়। দয়াময়ী তাহা বুঝিলেন; কহিলেন, ভিক্ষে ক'রেই হোক, দাসীবিত্তি ক'রেই হোক, দুটো পেট আমি চালিয়ে নিতে পারব বাবা, তুমি শুধু ন্যাড়ার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। ও যদি একটু ইংরেজী লিখতে পড়তে

শেখে তো সাহেব চাকরি ক'রে দেবে বলেছে। পণ্ডিত রাজি হইলেন। দিন কয়েক পরে স্থাড়াকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ইংরেজী শিখিবার জন্ত মাতামহের গৃহে পাঠানো হইল। দয়াময়ী পাড়ার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে একাধারে ঝি ও রাঁধুনীর কাজে ভর্তি হইলেন।

দিন একরকম করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু মেয়ে বড় হইতে লাগিল। গ্রামের পুরুষ ও মেয়ে—দুই মজলিসেই আলোচনা শুরু হইল। কিন্তু ভগবান সুরাহা করিলেন। পাড়ায় গগন গাঙ্গুলীর পত্নী বহুদিন যাবৎ কাসরোগে ভুগিতেছিলেন। একদিন কাসিতে কাসিতেই হঠাৎ হার্টফেল করিলেন। গগন পত্নীশোকে কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিল বটে, কিন্তু দুই দিন পরেই বিবাহ করিতে রাজি হইল। কাজেই পাড়ার লোকে ধরাধরি করিয়া দয়াময়ীর মেয়ে লক্ষ্মীকে গোটা কয়েক মন্ত্র পড়াইয়া গগনের পাশে দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু যিনি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত স্থান দখল করিতেছিলেন, তিনি উহা সহ্য করিলেন না। বৎসর খানেকের মধ্যেই গগনকে ইহলোক হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মী সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙিয়া সমাজের দেনা মিটাইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

সাত বৎসর পরে। বোধ করি ১৩৩০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। আমি তখন এম. এ. পাস করিয়া আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে সদ্য-উন্নীত হাই স্কুলটির কর্ণধারণ করিয়া কোনমতে টানিয়া লইয়া যাইতেছি, এমন সময়ে ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া উঠিল। নেতাদের মুখ হইতে গরম বুলি ছুটিতে লাগিল, দলে দলে ছেলেরা স্কুল ও কলেজ হইতে বাহির হইয়া গাঁজা-আফিঙের দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিল এবং দেশের যত তালগাছ কাটিয়া

ভূমিশায়ী করিতে লাগিল। আমাদের জেলা-শহরেও ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, খবর পাইলাম। অতএব মাহিনা আদায়ের আশা সিকায় তুলিয়া দিয়া আমাদের স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া হেডপণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছি, এমন সময়ে কানে আসিল—বন্দে মাতরম্! মহাত্মা গান্ধীকি জয়!

হেডপণ্ডিত মহাশয় মুক্তকচ্ছ হইয়া দরজার দিকে ছুটিলেন এবং উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ঘাড় নাড়িয়া, ও দুই হাতের করতল চিত করিয়া কহিলেন, এসে গেছে মশায়! আমি একবার ভোঁদাটাকে দেখিগে।—বলিয়া কাছা ও কোঁচা সামলাইতে সামলাইতে উল্টা দিকে ছুটিলেন।

আমি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম—আমাদের ন্যাড়া এবং তাহার পিছনে জনকয়েক স্কুল হইতে বিতাড়িত বেকার ছেলে। ন্যাড়ার মাথায় গান্ধীটুপি, পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। অন্য সেবকগুলি এখনও পোশাক সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ন্যাড়া সদলবলে আমার কাছে আসিল এবং নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার কাছেই এলাম দাদা।

কহিলাম, কখন এসেছিস?

ন্যাড়া উত্তর দিল, কাল রাত্রে।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে?

স্কুল তো ছেড়ে দিয়েছি।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস! কেন?

মৃদু হাস্য করিয়া ন্যাড়া কহিল, পড়াশুনা ক'রে কি হবে? পরাধীন দেশে—

বাধা দিয়া কহিলাম, পড়াশুনা না ক'রে কি করতে হবে?

ন্যাড়া দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া ও দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও প্রসারিত করিয়া কহিল, যুদ্ধ।

ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, যুদ্ধ! কার সঙ্গে?

ধীর উদাত্ত কণ্ঠে ন্যাড়া কহিল, যুদ্ধ ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে—

বলিস কি? গোলাগুলি কই?

গোলাগুলির প্রয়োজন নেই। আমাদের যুদ্ধ অহিংস যুদ্ধ। ব্রিটিশের শাসন আমরা মানব না। গোলাগুলি আমরা বুক পেতে নোব। আমাদের বুকের রক্ত দেশের বুকে ঢেউ খেলে যাবে, তাতে ভেসে যাবে আমাদের হীনতা, দীনতা, কাপুরুষতা ও পরাধীনতার মোহ। বুঝিলাম, ন্যাড়া কাহারও বক্তৃতা বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইতেছে। বাধা দিয়া কহিলাম, তোর দাদামশায় কিছু বললে না? ন্যাড়া রুখিয়া উঠিয়া কহিল, দাদামশায় আমার কে যে, তার কথা শুনতে হবে? মা, মামা, দিদি, দাদা, কেউ আমাদের নেই। দেশ আমাদের জননী, মহাত্মা গান্ধী আমাদের মন্ত্রগুরু, নকুড়বাবু আমাদের সেনাপতি—

প্রশ্ন করিলাম, নকুড়বাবু কে?

ন্যাড়া আকাশ হইতে পড়িল, পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, জেলা-কংগ্রেস-সভাপতি নকুড়বাবুকে চেনেন না? অথচ এ জেলাতে বাস করেন?

কহিলাম, নকুড়বাবুকে চেনবার আমার কি দরকার?

ঈষৎ হাসিয়া ন্যাড়া কহিল, সত্যি তো! জেলখানায় আমরণ পচতে হ'লে পাহারাওয়ালার সঙ্গে পরিচয় থাকলেই চলে। তবে নকুড়বাবু নিজেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করবেন বলেছেন।

তার মানে?

মানে, তিনি দিন কয়েক পরেই এখানে আসবেন। তারই আয়োজন করতে আমরা বেরিয়েছি। আপনার স্কুলের উঠোনটা আমাদের দরকার। সেইখানেই সভা হবে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, স্কুলের জায়গায় স্বদেশী সভা-টভা চলবে না, সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ন্যাড়া নির্বিকারভাবে কহিল, গেলই বা, স্কুল তো এমনিই উঠে যাবে। পিকেটিং ক'রে সব ছেলেকে আমরা বের ক'রে নোব। ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন ব'সে শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করবার সময় নয়, ছেলে বুড়ো সকলকে কোমর বেঁধে আগুন নেবাতে ছুটতে হবে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, ওসব দেঁতো বক্তিমে আমাকে শোনাতে হবে না, আমার ঢের শোনা আছে। তোকে ভাল কথা বলছি, শোন্। এসব ছেড়ে দে; লেখাপড়া শিখে মানুষ হোগে যা, মায়ের দুঃখ ঘোচা।

হাসিয়া ন্যাড়া কহিল, মায়ের দুঃখ ঘোচাবার জন্যেই তো বেরিয়েছি দাদা।

ন্যাড়ার পিছনে তেনা (এই ছেলেটা এ বৎসর দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন না পাইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছিল) শুদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভস্মীভূত করা যায় কি না, তাহাই এতক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিল; অবজ্ঞার সহিত কহিল, বাজে বকবার সময় নেই দাদা। আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। ন্যাড়া কহিল, সত্যি। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, আমরা আজ আসি। স্কুলের উঠোনেই সভা হবে। এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। তবে আর একটা কথা—কিছু ক'রে চাঁদা আমাদের দিতে হবে। নকুড়বাবুর মত লোক আসছেন, যেমন তেমন একটা

পার্স না দিলে ভাল দেখায় না। আচ্ছা, নমস্কার।—বলিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিল।

আড়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। লম্বা, দোহারা চেহারা, ফরসা রঙ, নীল রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানাইয়াছে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। মহেশ আচার্যের ছেলে! যে মহেশ আমরণ নিষ্ঠার সহিত সাহেব-সেবা করিয়াছে, সাহেব দেখিলে যে বিশ গজ দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হইত, এমন কি স্বপ্নে সাহেব দেখিয়া হামাগুড়ি দিত, তাহারই ছেলে কিনা সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে! বাহির হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের গ্রামে এ ফ্যাসাদ আনিল কেন? একে তো স্কুলটি এমনিই টলমল করিতেছে, তাহার উপর বাহির হইতে ধাক্কা পাইলে কি টিকিবে? একেবারে ভূমিশায়ী হইবে। তারপর? পত্নীর রণরঙ্গিণী মূর্তি মুহূর্তের জন্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, দ্বিধা নয়, সময়ক্ষেপ নয়, আশু প্রতিকারের প্রয়োজন। অতএব দ্রুতপদে সেক্রেটারি মহাশয়ের বাড়ি ছুটিলাম।

সেক্রেটারি মহাশয় স্কুল বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অতএব স্কুলে গিয়া ছাত্রদিগকে প্রাঙ্গণে সমবেত হইবার জন্য আদেশ দিয়া সদলবলে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হেডপণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, দেশের কতকগুলি বেকার ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করিতেছে, তাহা তোমরা প্রাণপণে পরিহার করিবে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব সর্বশক্তিমান ভগবানের আদেশে আমাদের মঙ্গলের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সহস্র বৎসর পূর্বে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

করিয়াছিলেন। যাহারা ইহার বিরুদ্ধতা করিয়েছে, তাহাদের পাপের সীমা নাই। তাহাদিগকে ইহলোকে আমরণ কারা-যন্ত্রণা ও পরলোকে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ইংরেজরা আমাদের যে কত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহা তোমরা প্রতিদিন পুস্তকে পাঠ করিতেছ। রেল-রাস্তা ও ইউনিয়ন-বোর্ডের কথা তোমরা জান। এই যে আমাদের কত শত লোক ইংরেজী শিখিয়া ভাল ভাল চাকুরি করিতেছে, মাসে মাসে মোটা মাহিনা ঘরে আনিতেছে, তাহা কি ইংরেজ রাজত্ব না হইলে হইত? তোমরা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার পত্নীকে দেখ নাই, (এ সময়ে জনকয়েক ছেলে দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দেখেছি সার্।) তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিলে ও কথাবার্তা শুনিলে কেহ তাঁহাদিগকে সাহেব ও মেম ছাড়া কিছুতেই আমাদের মত বাঙালী ভাবিতেই পারিবে না। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে?—তাঁহারা ইংরেজী শিখিয়াছেন, বিলাত গিয়াছেন ও ইংরেজদের কৃপা তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া। তোমরাও যদি নিষ্ঠাসহকারে ইংরেজী পাঠ কর, বড় হইলে তোমরাও যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, নেহাৎপক্ষে সার্কল-অফিসার হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব বৎসগণ, তোমরা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না। ছুটি হইলেই নিজ নিজ গৃহে গমন করত পাঠে মনোনিবেশ কর। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

পরিশেষে আমি ছাত্রদিগকে কোনও আন্দোলনে যোগদান না করিতে, ছুটিতে মনোযোগসহকারে লেখাপড়া করিতে এবং বাড়ি গিয়াই অবিলম্বে দুই মাসের বেতন পাঠাইয়া দিতে বলিয়া সভাভঙ্গ করিলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসিয়া সহকারী শিক্ষকগণের

সহিত আলাপ ও আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে অন্দর হইতে অবিলম্বে হুজুরে হাজির হইবার জন্ম পরওয়ানা আসিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, বারান্দায় ন্যাড়ার মা দয়াময়ী ও আমার পত্নী মুখামুখি বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া পত্নী মাথার ঘোমটা একটুখানি টানিয়া দিয়া, ফিসফিস করিয়া কহিলেন, কাকীমা কি বলছেন, শোন। দয়াময়ী কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, কি করব, বল দেখি? ন্যাড়া পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কহিলাম, দেখেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ন্যাড়ার।

আগ্রহের সহিত দয়াময়ী কহিলেন, দেখা হয়েছে? একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়েছ বাবা?

কহিলাম, আমি তাকে বোঝাব কি, সেই আমাকে বোঝাতে চায়!

পত্নী বিস্মিত স্বরে কহিলেন, বল কি।

কহিলাম, হ্যাঁ, বলে, স্কুল ভেঙে দিয়ে সবাই মিলে ওর সঙ্গে হৈ-হৈ করি।

ক্রুদ্ধস্বরে পত্নী কহিলেন, উচ্ছন্ন গেছে ছোঁ—। বলিয়াই উদ্যত রসনা সংযত করিলেন।

দয়াময়ী ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিলেন, আরও কত কি যে বলে বাবা, কিছু বুঝি না! বলে, আমি, লক্ষ্মী ওর কেউ না; ভারত না কে তার মা। বলে, যুদ্ধ করব, কোথায় আগুন লেগেছে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কি করি বাবা? ওর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি, ও যদি এমন করে তো, আমার মরাই ভাল।—বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। কহিলাম, আপনার বাবার দোষেই এতটা বেড়েছে কিনা! তিনি যদি ন্যাড়াকে এখানে পৌঁছে দিতেন কিংবা ওখান থেকে পালিয়ে আসামাত্র এখানে খবর দিতেন, তা হ'লে এতটা বাড়তে পেত না। তা না ক'রে তিনি

চুপ ক'রে ব'সে আছেন, আর এদিকে ন্যাড়া নানান জায়গায় গেছে, পাণ্ডাদের সঙ্গে মিশেছে, বক্তৃতা শুনে মাথা গরম করেছে, তারপর এখানে ফিরে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। চিন্তা কি শুধু আপনারই, ভেবেছেন? আমাদের চিন্তা আরও বেশি। গাঙুলী মশায় তো পরামর্শ করবার জন্যে দারোগাবাবুর কাছে ছুটেছেন।

আতকাইয়া উঠিয়া দয়াময়ী কহিলেন, দারোগা কেন বাবা? ন্যাড়াকে কি ধ'রে নিয়ে যাবে? কহিলাম, না, তা নয়। ন্যাড়া শহর থেকে লোক এনে এখানে বক্তৃতা দেওয়াবে বলছে কিনা, তাই।

পত্নী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, তাই পুলিসে খবর দিতে গেছে! এক ফোঁটা ছেলে, ওকে ধমকে দিলেই থেমে যাবে। তা না ক'রে দারোগা পুলিস! বুড়োর ভীমরতি ধরেছে দেখছি!

দয়াময়ী খপ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, তাই বল তো মা।

কহিলাম, ধমকালেও কিছু হবে না, পিঠে হাত বুলিয়েও কিছু হবে ব'লে ভরসা হয় না। কিছু যদি হয় তো, পুলিসের ভয়েই হবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমরা চেষ্টা করছি, আপনিও কান্নাকাটি ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখুন; তাতেও যদি না শোধরায় তো আপনার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতাপত্র সারিতেছিলাম, এমন সময়ে মিলিত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্'-ধ্বনি কানে আসিল। তাহার পরেই কোলাহল, তাহার পরে আরও প্রবলভাবে 'বন্দে মাতরম্', এবং কিছুক্ষণ পরেই হেডপণ্ডিত মহাশয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—আমি পুলিস ডাকব, আদালত করব, ঢিট বানাব ছোঁড়াদের। বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই পণ্ডিত হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাথায় হাত চাপড়াইয়া কহিলেন, সর্বনাশ হয়েছে মশায়!

রৌদ্ররস সহসা রোদনরসে পরিণত হইল দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, কি হ'ল মশায়? বাড়িতে অসুখ নাকি?

কান্না থামাইয়া পণ্ডিত কহিলেন, অসুখ হ'লে তো ভাল ছিল মশায়, বাড়িতে মরত; এ যে পুলিসের গুঁতো খেয়ে বেঘোরে মরবে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কার কথা বলছেন?

কেন? আমাদের ভোঁদা। হতভাগা ন্যাড়ার সঙ্গে মিশেছে গিয়ে। ছেলেটা আসল সয়তান মশায়! আমাকে কিনা চোখ রাঙায়! থাকত গায়ে ক্ষমতা তো, একটি একটি ক'রে ওর দাঁত আমি উপড়ে ফেলতাম! —বলিয়া হস্তভঙ্গী দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে বসাইয়া সমস্ত খবরটা শুনিয়া লইলাম। ব্যাপারটা এই—পণ্ডিত-গৃহিণী শয়নকক্ষের কুলুঙ্গিতে বাজার-খরচের জন্য একটি সিকি রাখিয়াছিলেন। সকালে খোঁজ করিতে গিয়া দেখা গেল, সিকিটি অন্তর্ধান করিয়াছে এবং তাহার বদলে রহিয়াছে একটি চিরকুট। গৃহিণী হতভম্ব হইয়া চিরকুটটি পণ্ডিতকে দিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিতের ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি গৃহিণীকে মারিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভুল বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করত স্বরাজ-আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, স্বরাজ-আশ্রম কোথায়?

পণ্ডিত জবাব দিলেন, কেন? ওই যে মহেশ আচায্যির বাইরের চালাঘরটা। পতাকা উড়িয়েছে, স্বরাজ-পতাকা—

তারপর?

তারপর পণ্ডিতকে বেশিদূর যাইতে হইল না। রাস্তাতেই স্বরাজ-সংঘের দেখা মিলিল। পণ্ডিত সটান তাহাদের মধ্যে গিয়া পুত্র

ভোঁদড়চন্দ্রের কর্ণধারণ করিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল।

ন্যাড়া তাড়া করিয়া আসিয়া ধমকাইয়া কহিল, ছেড়ে দিন। পণ্ডিত তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। সেবক-সংঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ন্যাড়া মারমুখী হইয়া কহিল, আমাদের কোনও মেম্বারের গায়ে হাত দেবার কোনও অধিকার আপনার নেই। পণ্ডিত দাঁত মুখ খিঁচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আগে স্বরাজ-সেবক, না আগে তাঁর ছেলে?

ন্যাড়া কহিল, আপনার ছেলে তার প্রমাণ কি?

রাগে পণ্ডিতের সর্বদেহে আগুন ধরিয়া গেল। কহিল, প্রমাণ? প্রমাণ এই।—বলিয়া তিনি ভোঁদার কর্ণত্যাগ করিয়া কর্ণমূলে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন।

ভোঁদা টলিতে টলিতে সামলাইয়া লইয়া সেবকব্যূহের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সকলে 'বন্দে মাতরম্' হাঁকিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ টিকির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। পণ্ডিত অগত্যা তাহাদের জীবিত ও মৃত পিতামাতাদের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে করিতে স্থানত্যাগ করিলেন।

কহিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নি।

পণ্ডিত হাঁকিয়া কহিলেন, ভাল হয় নি? বলেন কি মশায়? নিজের ছেলে কুসঙ্গে প'ড়ে ব'য়ে যাবে, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে চোখে দেখব! তা ছাড়া সিকিটা—। উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, ওর যে গলচ্ছেদন করি নি, এই ওর ভাগ্যি!

কহিলাম, ভাগ্যি ওর নয়, আপনার। মহাভারতের যুগ নয়,

ইংরেজ রাজত্ব; পুত্রের জীবন ভরণের দায়িত্ব আছে, হরণের অধিকার নেই।

কিন্তু মশায়, একটা ছেলের জন্যে গাঁয়ের সব ছেলেগুলো ব'য়ে যাবে, আর আমরা সবাই থাকতে কোন উপায় হবে না?

উপায় আর কি হবে?

ভোঁদাকে ওর মামার বাড়ি পাঠিয়ে দোব। অজ পাড়াগাঁ—এখনও প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ চলছে সেখানে।

ছেলে যদি যেতে না চায়?

ত্যাগ করব।

যদি তার আগেই সে আপনাকে ত্যাগ করে?

পণ্ডিত মশায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, কি যা-তা বলেন মশায়! নিজের ছেলেরা বড় হয় নি কিনা, তাই দিল ঠাণ্ডা ক'রে ব'সে আছেন। আপনার কাজ নয়, যাই গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে। উপায় বাতলে যদি কেউ দিতে পারেন তো, তিনিই।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন বিকালবেলায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, পত্নী অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু ও নাসিকা মুছিতেছেন।

কহিলাম, সর্দি করেছে নাকি? ভারী গলায় উত্তর দিলেন, না, ন্যাড়া এসেছিল। ন্যাড়ার আগমনের সহিত নাসিকা ও নয়ন হইতে নীর নির্গমনের সম্পর্ক স্থির করিতে না পারিয়া কহিলাম, তাতে কি?

পত্নী আমার কথার জবাব না দিয়া কহিলেন, ভগবান যে এখনও কি ক'রে সহ্য করছেন, তাই ভাবছি!

ভগবানের আবার কি হইল! কহিলাম, কি হয়েছে? স্যাঁতসেঁতে ঘোলাটে আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কিছু জান না নাকি? শোনগে ন্যাড়ার কাছে। ভয়ে ভয়ে কহিলাম,

তুমিই বল না, শুনি। পত্নী কহিলেন, দেখ, চালাকি ক'রো না। আমি না হয় মুখ্যু মানুষ; তুমি তো লেখাপড়া জান, খবরের কাগজ পড়; কিছু জান না তুমি? বোকার মত চাহিয়া রহিলাম। পত্নী কহিলেন, পাগলা কুকুরের মত গুলি ক'রে মারছে, ছেলে বুড়ো মেয়েমানুষ পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না, মায়ের বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে আছড়ে মারছে, ঘরের বউকে উলঙ্গ ক'রে চাবকাচ্ছে—কিচ্ছু জান না তুমি? গম্ভীরভাবে কহিলাম, ওসব মিথ্যে কথা, ন্যাড়া বানিয়ে বলেছে। দুই চোখ দীপ্ত করিয়া পত্নী কহিলেন, মিথ্যে নয়, মিথ্যে হ'লে দেশের ছেলেরা সব ক্ষেপে উঠত না, তা ছাড়া আজকাল ছেলেরা মিথ্যে বলে না। বল বরং—

কথার জের টানিয়া কহিলাম, আমরা।

সত্যিই তো। তোমরা মিথ্যের পর্দা বানিয়ে তার আড়ালে আত্মরক্ষা করছ, পাছে ঘর থেকে বেরুতে হয়। তোমরা শুধু কাপুরুষ নয়, অমানুষও।

পত্নীর দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলাম, ন্যাড়ার দলে যোগ দিই, তাই কি তুমি চাও?

পত্নী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। কহিলাম, চাকরি যাবে কিন্তু।

গেলই বা, ভারি তো চাকরি! এক বচ্ছর পরে আমাদের রাজত্ব হ'লে কত ভাল চাকরি হবে।

ন্যাড়া বলেছে বুঝি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

জেলে যেতে হবে কিন্তু।

পত্নী একটু থমকিয়া থাকিয়া কহিলেন, জেলে যেতে হবে কেন?

বা রে! সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করব, আর সরকার বুঝি পিঠে হাত বুলিয়ে খেতাব দেবে!

ন্যাড়া যে বলছিল, সকলের জেলে যাবার দরকার নেই!

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তা বলবে বইকি। স্বরাজ যদি হয়, তা হ'লে যারা জেল খাটবে, তারাই বড় বড় চাকরি পাবে। কাজে যদি নামতেই হয়, জেলে আমি যাবই।

পত্নী কিছুক্ষণ চিন্তাকুলভাবে থাকিয়া কহিলেন, বেশ, যেও। কত ছেলেমানুষ জেলে যাচ্ছে! তাতে আর ভয় কি?

স্ফূর্তিসহকারে কহিলাম, বেশ, তাই হবে। আজ থেকেই লাপসি প্র্যাক্‌টিস করব। 'সরকার সেলাম' তো রপ্ত হয়েই আছে। তোমাকে আর নাক ঘ'ষে ঘ'ষে পাকা বিলিতী বেগুন ক'রে তুলতে হবে না।—বলিয়া দ্রুতবেগে স্থানত্যাগ করিলাম।

মনে দুঃখ ও অভিমান হইল। নিজের স্ত্রী যাহাকে জেলে পাঠাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, তাহার আর সংসারবাসের প্রয়োজন কি? কপালে যাই থাক্‌, কালই নকুড়বাবুর দলে নাম লিখাইব। কিন্তু ন্যাড়ার এ কি অন্যায়! সদরে যাহাই কর, অন্দরে আন্দোলন ঢুকাইবার দরকার কি? অথবা ইহাই বোধ হয় প্রোপাগাণ্ডার প্রথম নীতি। পুরুষদের দলে আনিতে চাও? মেয়েদের হাত কর! সৈন্য চাই? বাড়ির মেয়েদের ক্ষ্যাপাইয়া দাও, দলে দলে লোকে সৈন্যদলে নাম লিখাইবে। ভোট আদায় করিতে চাও? মেয়েদের ক্যান্‌ভাস করিতে পাঠাও, দেশসুদ্ধ লোক তোমাকেই ভোট দিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। গুরুগিরির ব্যবসা করিতে চাও? মেয়েদের ধরিয়া শিষ্যা কর, পুরুষগুলি আপনা হইতে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিবে।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের বৈঠকখানায় হাজির হইলাম। তখনও আলো

জানা হয় নাই। ঘরে ঢুকিতেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা কানে আসিল, জেলে দেবে মাগী। থাকবি কাকে নিয়ে? গাঙ্গুলী-গিন্নী জবাব দিলেন, হ্যাঁ, জেলে দেবে, না আর কিছু! মিন্সে ভয়েই গেল! গাঁয়ের মধ্যে গণ্যিমান্যি ব'লেই না ছেলেরা আবদার করছে! কই, আর কারও কাছে তো যাচ্ছে না!

গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, যাবে কেন? ওসব রেখো হারামজাদার পরামর্শ। আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা।

হ্যাঁ, সবাই ওকে বিপদে ফেলবারই চেষ্টা করছে! ন্যাড়া তো বলছিল, তুমি না হ'লে রাধু হবে বলেছে।

গাঙ্গুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলেছে ন্যাড়া?

গাঙ্গুলী-গিন্নী জবাব দিলেন, বলেছে, রাধু হবে। তা হ'লে মুখ একেবারে ঝলমল করবে তোমার।

গাঙ্গুলী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, হোকগে, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

গাঙ্গুলী-গিন্নী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, বেশ। আমিও তোমার সংসারে নেই। থাকগে তুমি তোমার দারোগা, চৌকিদার আর সার্কল-বাবু নিয়ে। ছেলে নেই, আছে তো একপাল মেয়ে। কে তোমার বাড়িঘাট নেবে? পিসিডেন্টগিরির মুখে ঝাঁটা!

গাঙ্গুলী মহাশয় সদম্ভে কহিলেন, কি! মুখে ঝাঁটা! চললাম দেশ ছেড়ে। এমন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার চেয়ে বৈরেগী হয়ে বোষ্টমী নিয়ে থাকা ভাল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, খবরদার! ওসব কথা ব'লো না বলছি।

একশো বার বলব, এখুনি চললাম আমি শ্যামপুরের আখড়ায়।

বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে আমার ঘাড়ের উপর পড়িলেন। আমি পড়িতে পড়িতে দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইলাম, এবং গাঙ্গুলী মহাশয় সামলাইলেন আমাকে দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, কে, কে? রেধো বুঝি? আড়ি পাতা হচ্ছে, না?

কহিলাম, না দাদামশায়, আমি।

গাঙ্গুলী মহাশয় নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, ওঃ, তুমি। ভারি ফ্যাসাদে পড়েছি ভায়া। বাইরে চল, বলছি।

চলিতে চলিতে কহিলাম, বলতে হবে না, বুঝেছি। কাল সভাপতি হতে হবে, এই তো?

হ্যাঁ হে। হ্যাড়া হতভাগা গিন্নীকে ক্ষেপিয়েছে। কি করা যায় বল দেখি?

আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করছেন, আমার বাড়িতেও—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলী কহিলেন, নাতবউকেও ক্ষেপিয়েছে বুঝি? কি বলছে নাতবউ?

বলছে, জেলে যেতে হবে।

আর আমার স্কুল? জাহান্নমে যাবে, না? হ্যাড়াকে গাঁ থেকে তাড়াব আমি, তুমি দেখে নিও।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

দারোগাবাবুর কাছে। একটা উপায় তো করতে হবে। তুমিও চল ভায়া।

রাত্রে আহারের সময়ে তরকারি মাছ ইত্যাদি দূরে সরাইয়া দিয়া শুধু ডাল ও ভাত চটকাইয়া পায়সের মত করিয়া মাখিয়া সপাসপ গিলিতে লাগিলাম। পত্নী যথারীতি কাছে বসিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, গম্ভীরভাবে কহিলেন, ও কি হচ্ছে?

কহিলাম, লাপসি খাওয়া অভ্যাস করছি। জেলে গিয়ে তো এইই খেতে হবে। পরম পরিতোষ সহকারে কহিলাম, মন্দ নয়, বেশ লাগছে খেতে। খাবার কিছু কষ্ট হবে না দেখছি। একটু একলা একলা ঠেকবে হয়তো, তা ভাল একজন সঙ্গী পেলে—

পত্নী কহিলেন, জেলে আবার সঙ্গী কোথায় পাবে?

কহিলাম, আগে পাওয়া যেত না বটে। আজকাল দলে দলে মেয়ে পুরুষ জেলে যাচ্ছে। এত লোক থাকবার জায়গা কোথায়? এক এক ঘরে মেয়ে পুরুষ সব ঠাসাই ক'রে রেখে দেয়।

পত্নী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে রাখে?

খাইতে খাইতে ভরাট মুখে কহিলাম, রাখেই তো। ওই তো মজা, না হ'লে এত লোক জেলে যাচ্ছে! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, বেশ সুন্দরী, অমায়িক, মিষ্টি একটি সঙ্গী পাই তো আর জেল থেকে ফিরব না। যাবজ্জীবন থেকে যাব সেই জেলে।

পত্নী জবাব না দিয়া গম্ভীরমুখে উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে গাঙ্গুলী মহাশয়ের ছোট মেয়ে টুনু আসিয়া কহিল, মা আপনাকে ডাকছে।—বলিয়া কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পূর্বেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, দিদিমা বারান্দায় গুম হইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভাই, ব'স।

উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসুমুখে গাঙ্গুলী-গিন্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন, উনি কাল রাত্রে রাগ ক'রে বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

গাঙ্গুলী-গিন্নী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিলেন, কাল ঝাড়া

এসে বললে, আজ নাকি ওদের সভা হবে, ওঁকে সভাপতি হতে হবে। গাঁয়ে গণ্যিমাস্থি, মানুষের মত লোক বলতে উনি ছাড়া কে আছে, বল? আমি মত দিলাম। অন্যায় কিছু করেছি ভাই? কিন্তু ওঁকে বলতেই উনি রেগে উঠলেন, মুখে যা এল তাই বললেন, শেষে রেগে বেরিয়ে গেলেন।

কোথাও খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন?

গাঙ্গুলী-গিন্নী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন, খোঁজ করতে কার দায় পড়েছে! কচি খোকা তো নয় যে, হারিয়ে যাবে, কি ছেলেধরায় ধ'রে নিয়ে যাবে! কিছু করব না; আরও কিছুক্ষণ দেখব, না আসে তো মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাব। দেখব, বুড়ো কি করে!

গম্ভীরভাবে কহিলাম, দেখুন দিদিমা, ওসব করবেন না। দাদা মশায়ের সত্যি কদিন থেকে মন-খারাপ। বৈরেগী হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

দিদিমা গাম্ভীর্য পরিহার করিয়া, সরিয়া বসিয়া ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন, তোমাকে বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ, যেদিন শ্যামপুরের আখড়ার বৈষ্ণবীরা কেত্তন গাইলে, তার পরদিনই—

গাঙ্গুলী-গিন্নী শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, কি, বলছিল কি?

বলছিলেন, ভাল লাগে না সংসার। প্রেসিডেণ্টগিরি হাতে না থাকলে চ'লে যেতাম। গাঙ্গুলী-গিন্নী গুম হইয়া রহিলেন।

কহিলাম, আমি বলি কি, ওঁর যা ভাল লাগে তাই করুন। জোর-জবরদস্তি না করাই ভাল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী নীরসকণ্ঠে কহিলেন, কে আর জোর-জবরদস্তি করছে

ভাই! যা ইচ্ছে করুন না! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি ডেকে নিয়ে আসতে পার? আমি মেয়েমানুষ, আমার যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় গেছেন তিনি?

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী কহিলেন, বোধ হয় শ্যামপুর।

শ্যামপুরে বহুদিন হইতে একটি বৈষ্ণবদের আখড়া আছে। সেখানে কতকগুলি মধ্যবয়সী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী স্থায়ীভাবে বাস করে। বৈষ্ণবীরা প্রায়ই আমাদের গ্রামে ভিক্ষা করিতে আসে। সম্প্রতি সোনাপুরে বৈষ্ণবদের একটি মেলা হইয়াছিল। সেখান হইতে ফেরত কতকগুলি নবীনা ও সুশ্রী বৈষ্ণবী আখড়াতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদেরই এক জোড়া দিন কয়েক আগে আমাদের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কীর্তন গাহিয়া গিয়া গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কহিলাম, শ্যামপুর গেছেন, কে বললে?

গাঙ্গুলী-গিন্নী ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, তা ছাড়া যাবার আর কোন চুলো আছে, শুনি? দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, আগে হ'লে ঝাঁটা মেরে—

কহিলাম, এই দেখুন, আপনি রাগ করছেন। তা হ'লে ডেকে এনে কাজ নেই। এলেই আবার ঝগড়া করবেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নী রাগ সামলাইয়া লইয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, না, ঝগড়া করব না, তুমি ডেকে আনগে।

শ্যামপুর নহে, থানার দিকে অগ্রসর হইলাম। কারণ দারোগা-বাবুর পরামর্শমত গাঙ্গুলী মহাশয় থানাতেই রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়কে আনিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় থাকিয়া কর্তা ও গিন্নীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। গিন্নী কহিলেন,

হ্যাগা, কাল সারারাত্তির কোথায় কাটালে? আমি ভেবে বাঁচি না। মাস্টার নাতিকে ডেকে খুঁজতে পাঠালাম।

কর্তা গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, কোথায় আবার? বুড়ো শিবের আটচালায়—

বিস্ময়ের সহিত গিন্নী কহিলেন, অ্যাঁ! ওই ভূতের আড্ডায়! কাছেই শ্মশান! ওমা! আমার কি হবে!

গাঙ্গুলী উদাসকণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছে শ্মশান সংসার দুইই সমান; আর কটা দিন বা আছে!

গৃহিণী কহিলেন, দেখ, ওসব অলক্ষুণে কথা ব'লো না বলছি।

গাঙ্গুলী কহিলেন, মিথ্যে বলি নি গিন্নী। মেঘে মেঘে বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে।—বলিয়া ঈষৎ দার্শনিক হাস্য হাসিলেন। তারপর কহিলেন, আমার চাদর আর কামিজটা একটু পরিষ্কার ক'রে দিও।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন গা?

বিকেলবেলায় আবার সভা আছে।

গৃহিণী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, না না, সভা-টভায় গিয়ে কাজ নেই।

গাঙ্গুলী কহিলেন, পাগল! ছেলেরা ধরেছে, সভাপতি না হ'লে লোকে বলবে কি! প্রেসিডেণ্টগিরির কথা ভাবছ? ও আমি ছেড়ে দোব, দারোগাবাবুকে ব'লে এসেছি।

গৃহিণী কহিলেন, পাগল হয়েছ নাকি? ওসব কিছু ছাড়তে পাবে না তুমি।

ওসবে কি হবে গিন্নী? আমার না ছেলে, না পিলে! আছে তো গণ্ডা কয়েক মেয়ে।

গৃহিণী সতেজে কহিলেন, দেখ, এক পা তোমাকে আমি ঘর থেকে

বেরুতে দোব না। সভার নাম করেছ তো, আমি ব'লে দিচ্ছি, পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হব আমি।

মধ্যাহ্নের আহারের পর শয়নকক্ষে না গিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?

কহিলাম, আসছি একটুখানি ঘুরে।

রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে। এখন আর ঘুরতে যেতে হবে না, ঘরে শোওগে যাও।

মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, আসছি চট ক'রে। হাতে তো আর বেশি দিন নেই, অথচ জেলে সারাদিন রোদেই কাজ করতে হবে।

পত্নী কহিলেন, তাই রোদ অভ্যেস করছ? কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া, শ্লেষের সহিত কহিলেন, কাল রাত্রে তো লাপসি অভ্যেস হ'ল; কিন্তু আজ তো তরকারি, মাছ, দুধ, কিছু ফেলে রাখতে দেখলাম না। কড়া গলায় কহিলেন, ন্যাকামি না ক'রে শোওগে যাও বলছি।

কহিলাম, একটুখানি—

মুখ লাল করিয়া পত্নী কহিলেন, আচ্ছা, যাও।—বলিয়া দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন। আমিও আর বেশি বাড়াবাড়ি করা বিপজ্জনক ভাবিয়া শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া দেখি, পত্নী সামনে বসিয়া আছেন। কহিলেন, দেশের জন্যে দুশ্চিন্তায় তোমার যে মোটেই ঘুম হচ্ছে না গা! কবরেজকে ডাকতে পাঠাব? উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কহিলাম, পাঠাও। হঠাৎ সভার কথা মনে পড়িল,

কহিলাম, ন্যাড়া আসে নি? পত্নী কহিলেন, এসেছিল। বেচারী ভারি বিপদে পড়েছে। গাঙ্গুলী বুড়ো সভাপতি হবে বলেছিল, গিন্নী নাকি জবাব দিয়ে পাঠিয়েছে। তোমাকে বলতে এসেছিল। কহিলাম, তুমি কি বললে?

পত্নী কহিলেন, বললাম, উনি তো জেলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, ওঁকে আর কেন? নতুন কাউকে ধরগে।

সহসা 'বন্দে মাতরম্'-ধ্বনিতে পল্লীর আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। কহিলাম, এসে গেছে নকুড়বাবু, যাওয়া যাক। পত্নী হাসিয়া কহিলেন, না গো, ওসব ছেলে-ধরার কাছে গিয়ে কাজ নেই। ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে পালাবে।

গম্ভীরভাবে কহিলাম, ঝুলিতে পুরতে হবে কেন? আমি তো এমনিই যেতে প্রস্তুত।

স্কুল-প্রাঙ্গণে নহে, চণ্ডীমণ্ডপে সভার আয়োজন করা হইয়াছে। স্কুলের চেয়ার বেঞ্চি কিছুই দেওয়া হয় নাই। নবনির্বাচিত সভাপতি রাধাশ্যাম নায়ক তাহার বাড়ি খালি করিয়া একটি টেবিল, দুইখানি চেয়ার ও একখানি বেঞ্চি ধার দিয়াছে। তাহাই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে পাতিয়া সভাপতি ও মাননীয় অতিথিগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং শ্রোতাদের জন্য খালি ঢালাও মেঝে, ইহার জন্য অবশ্য কিছুই ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। মহিলা শ্রোতাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে (ইহা অবশ্য নকুড়বাবুর আদেশে ও অভিপ্রায়ে)। মন্দিরের চাতালে খান দুই চট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আব্রু রক্ষার জন্য খান তিন বিছানার চাদর সামনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া ন্যাড়া আগাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল ও সভার মধ্যে লইয়া গিয়া, নকুড়বাবুর পাশে বসাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত পরিচয়

করাইয়া দিল। নকুড়বাবু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, আপনি এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার? ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সভাপতি রাধাশ্যামের পাশে একখানি চেয়ারে একটি সুন্দরী তরুণী গম্ভীরবদনে উপবিষ্টা। ন্যাড়াকে চক্ষের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিল, নকুড়বাবুর মেয়ে শ্রীমতী রেবা। ন্যাড়া রেবা দেবীর কাছে গিয়া আমার কথা বলিতেই তিনি মৃদু হাস্য ও কটাক্ষ সহযোগে মস্তক আন্দোলন করিয়া আপ্যায়ন জ্ঞাপন করিলেন। রাধাশ্যাম গলাবন্ধ কোটের নীচে ভুঁড়ি ও মাথার সামনে টাক লইয়া গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করিয়া বসিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপে, মন্দিরের চাতালে ও চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। শিশু ও স্ত্রী কণ্ঠের কলরোলে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। নকুড়বাবু কহিলেন, নারায়ণবাবু (ন্যাড়ার পোশাকী নাম) খুব প্রচারকার্য করেছেন। ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইলাম। মনে মনে কহিলাম, প্রচারকার্য করিতে হয় নাই; আপনা হইতেই সকলে আসিয়াছে এবং তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসে নাই। ভাবিয়াছে, যাত্রাগান হইবে অথবা বাজি হইবে। তা ছাড়া জামা-জুতা-পরা, বিনুনি-ঝোলানো, সুন্দরী তরুণী দেখার সৌভাগ্য তাহাদের সহজে ঘটে না।

ন্যাড়া চীৎকার করিয়া কোলাহল থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাহার সহকর্মীগণ গায়ে নীল রঙের খদ্দরের জামা ও মাথায় গান্ধী-টুপি আঁটিয়া সকলের বসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জনতা শান্তভাব ধারণ করিল। তখন ন্যাড়া টেবিলের কাছে আসিয়া রাধাশ্যামকে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করিল, এবং কেবলা তাহাকে সমর্থন করিল।

কিন্তু রাধাশ্যাম তো সভাপতির আসন আগেই দখল করিয়াছে। রাধাশ্যাম কাপড়ের দোকান ও সুদী কারবার করে। বার কয়েক ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বার হইবার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হওয়ার জন্যই বোধ করি ন্যাড়ার দলে যোগ দিয়াছে। সর্বসমক্ষে চেয়ারে বসিবার সুযোগ জীবনে তাহার কখনও আসে নাই। কাজেই বসিবার জন্য চেয়ার দিয়াছে এবং পাছে কেহ দখল করে সেইজন্য আগে হইতে বসিয়া আছে। আজ তাহাকে সভাপতি না করিলে সে চেয়ার মাথায় করিয়া সভা ত্যাগ করিত।

ন্যাড়া রাধাশ্যামের কানে কানে কহিল, ধন্যবাদ দিন।

রাধাশ্যাম কহিল, ধন্যবাদ কিসের? চাঁদা দিয়েছি, চেয়ার টেবিল দিয়েছি—। ন্যাড়া কহিল, ওটা নিয়ম।

রাধাশ্যাম চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়াই কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ।

রেবা দেবী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তারপর ন্যাড়া নকুড়বাবু ও তাঁহার কন্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রোতাদের উদ্দেশে জ্ঞাপন করিল এবং নকুড়বাবুকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

নকুড়বাবুর দেহ দীর্ঘ ও শীর্ণ, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশের যোগ্যতম প্রতিনিধি। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। চিলের ঠোঁটের মত নাক; ছোট চোখ, কিন্তু দৃষ্টি ধারালো। চোখের কোল ও বসা গালের মধ্যে উঁচু চোয়াল; গলদেশ ব্যাপিয়া পিরামিডের মত সমুন্নত কণ্ঠাস্থি। গায়ে হাতকাটা খদ্দরের ফতুয়া, পরিধানে খদ্দরের কটিবস্ত্র ও পায়ে স্বদেশী চটি।

কিন্তু রেবা? সুন্দরী—তন্বী—তরুণী। মুখের চেহারা নকুড়বাবুর মত চৌকোণা নহে, একটু লম্বা ধরনের। সূক্ষ্মাগ্র চিবুক, পাতলা

ঠোঁট, উজ্জ্বল ও কালো চোখ। ওই চোখ হইতে অপাঙ্গ দৃষ্টি একবার যাহার উপর পড়ে, তাহার স্বদেশ-সেবক হওয়া ছাড়া বোধ হয় আর কোন উপায় থাকে না। পরিধানে খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি এবং খদ্দরেরই শাড়িসঙ্গত ব্লাউজ। ধবধবে ফরসা পা দুইটিতে গাঢ় নীল ভেল্‌ভেটের ফিতাওয়ালা স্যাণ্ডেল। গায়ে গহনার বাহুল্য নাই। হাতে মাত্র দুইগাছি করিয়া প্লেন সোনার চুড়ি ও কানে দুল।

নকুড়বাবু দাঁড়াইতেই রেবা দেবী চেয়ার টানিয়া আমার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, আপনি হেডমাস্টার? কহিলাম, হ্যাঁ।

মধুর হাস্য করিয়া রেবা দেবী কহিলেন, আর কতদিন গোলামখানার সর্দারি করবেন? চ'লে আসুন না আমাদের সঙ্গে!

ছাত্রদের গ্রামার ও কম্পোজিশন পড়াইতে পড়াইতে মনের উপর ছাতা পড়িয়া গেলেও বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিতে লাগিল ও কান দুইটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। এমনই করিয়া মিষ্ট হাসিয়া কোন সুন্দরী তরুণী যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলে তো অবলীলাক্রমে দিতে পারি, কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তো কিছুই নহে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী ও ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়িল, মনে মনে কহিলাম, হে মা মঙ্গলচণ্ডী! রক্ষা কর মা! আজিকার মত সামলাইয়া দাও। রেবা দেবী কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা গান্ধী জেলে, বড় বড় নেতাদের কেউ জেলের বাইরে নেই, সারা দেশের বুকে আগুন জ্ব'লে উঠেছে (ন্যাড়াও এমনই ধরনের কথা বলিয়াছিল), আর আপনারা আরাম ক'রে বাড়িতে ব'সে আছেন? ওদিকে নকুড়বাবু নির্বিচারে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—একদিন আমাদের গৃহে গোলাভরা ধান ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল, মনভরা সুখ ও শান্তি ছিল। ইংরেজ তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের মত দরিদ্র, আমাদের মত হীন ও আমাদের মত

হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কে আছে? নিজের মাকে আমাদের মা বলিয়া ডাকিবার জো নাই, ইংরেজ গলা টিপিয়া ধরিবে, নিজের মায়ের লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে গেলে ইংরেজ বন্দুক উঁচাইবে—।

এই সময়ে কতকগুলা লোক সামনে বসিয়া রেবা দেবীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক মজাদার আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের দিকে তাকাইয়া তর্জনী উঁচাইয়া নকুড়বাবু বলিতে লাগিলেন, আমার কথা আপনাদের ভাল লাগিতেছে না; ভাল লাগিবার কথাও নহে। দুই শত বৎসর ধরিয়া পশুর মত জীবনযাপন করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মচেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। শৃঙ্খলিতা, নিপীড়িতা, ভূলুণ্ঠিতা দেশ-জননীর করুণ ক্রন্দন আপনারা শুনিতে পাইতেছেন না। সে ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাত্মা গান্ধী, সে ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র, সে ক্রন্দন শুনিয়াছি আমরা। তাই ঘর ছাড়িয়া আমরা বাহিরে আসিয়াছি। ঘরে আমাদের আগুন লাগিয়াছে, চাহিয়া দেখুন—(সকলে নকুড়বাবুর তর্জনীনির্দিষ্ট দিকে ফিরিয়া চাহিল।) ঘরের মটকায় আগুন লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, (চণ্ডীমণ্ডপের চারিদিকে গ্রামের বাউড়ী ও বাগদীদের ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়াছিল। সেখানে কোলাহল উঠিল—আগুন, আগুন। ভলাণ্টিয়াররা তাহাদের থামাইতে লাগিল, সে আগুন নয়, অন্য আগুন, তোরা চুপ কর্।) ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসুন। আগুন নিবাইতে হইবে। সব দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়াছে, প্রাণ দিতেছে, বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে—আর্তনাদে দেশের আকাশ ভরিয়া গেল, আপনারা কি বধির হইয়া বসিয়া থাকিবেন? আসুন— দ্বিধা নয়, প্রতি মুহূর্ত মূল্যবান। আসুন, ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক তেত্রিশ কোটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন ও ছেষট্টি কোটি দৃঢ়মুষ্টি বাহু লইয়া

একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ি। দেখিতে দেখিতে গৃহ আবার গড়িয়া উঠিবে, দেখিতে দেখিতে আমাদের মা রাজলক্ষ্মী-মূর্তিতে আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইবেন। বল ভাই সব—বন্দে মাতরম্।

ন্যাড়া ও তাহার দল হাঁকিল, বন্দে মাতরম্। দুই-একজন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া হাঁকিল, বন্দে মাতরম্।

রেবা দেবী মারাত্মক হাসি হাসিয়া কহিলেন, বলুন, বন্দে মাতরম্, দোষ নেই।

হাসিয়া কহিলাম, বলেছি তো, মনে মনে বলেছি।

রেবা দেবী কহিলেন, কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? ফাঁকির ফাঁক দিয়ে মনুষ্যত্ব যে একেবারে নিঃশেষে বেরিয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন না?

নকুড়বাবু আসিয়া আসনগ্রহণ করিলেন। ন্যাড়া রাধাশ্যামকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিল। রাধাশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল, ধেৎ! পাগল নাকি! ওসব আমি পারব না। ন্যাড়া কহিল, নিয়ম।

টানাটানি করিয়া ন্যাড়া রাধাশ্যামকে দাঁড় করাইয়া দিল। রাধাশ্যাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। ন্যাড়া তাগিদ দিয়া কহিল, বলুন, বলুন। রাধাশ্যাম কোনমতে বলিল, ইনি যা বললেন, খুব ভাল কথা, তোমরা সবাই এঁর কথামত কাজ ক'রো। এমন সময়ে পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, রাধাশ্যামের বিলিতী কাপড়ের দোকানে আজই আগুন ধরিয়ে দাও। রাধাশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, ও কাজ নয়। ওসব করলে ভাল হবে না বলছি। ন্যাড়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল।

রেবা কহিলেন, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আসুন না আমার সঙ্গে! আমি ন্যাড়াকে ডাকিতেই কহিলেন, আসুন

না আপনিও! রেবা দেবীকে সঙ্গে করিয়া মেয়েদের সামনে যাইতেই ভাদ্রবধূসম্পর্কীয়া মেয়েগুলি ঘোমটা টানিল, বালিকাগুলি ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল, ঠাট্টাসম্পর্কীয়া ও অ-ঠাট্টাসম্পর্কীয়া গুরুজনেরা সকলেই মুচকি হাসিল এবং পত্নী তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

রেবা দেবী নারীবৃন্দের উদ্দেশে কহিলেন, আপনাদের ওপরেই আমাদের এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে। আপনাদের এখনই ঘর থেকে বেরুতে আমি বলছি না। আপনারা শুধু পুরুষদের ঘর থেকে বের ক'রে দিন। পতি পুত্র পরিজন নিয়ে আরাম ক'রে সংসার করবার সময় আমাদের নয়। রাজপুত রমণীদের কথা আপনারা জানেন, তাঁরা নিজের হাতে স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিতেন, পরাজিত হয়ে ফিরে এলে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না, এমন কি চিনতে পর্যন্ত চাইতেন না। তাঁরা কি তাঁদের স্বামীদের আপনাদের চেয়ে কম ভালবাসতেন? না, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের ভালবাসতেন খুব, কিন্তু আরও বেশি ভালবাসতেন স্বাধীনতা, শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্ব। আর এক কথা, আন্দোলন চালাতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন। আমরা সবাই দরিদ্র, কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে সাগর, কণা কণা বালি নিয়ে মরুভূমি। নারায়ণবাবু আমাদের কিছু চাঁদা তুলে দিয়েছেন পুরুষদের কাছ থেকে, আপনারাও কিছু দিন। আপনাদের এ দান, যে খাতায় আমাদের জীবনের জমা ও খরচের হিসাব লেখা হচ্ছে, সেখানে জমার ঘরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

ইহার পর সকলেই ঘোমটা টানিল ও পিছন ফিরিয়া বসিল। শুধু আমার পত্নী হাতের একগাছি চুড়ি খুলিয়া আমার মেয়ের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাড়া রেবা দেবীর কানে কানে কি বলিতেই তিনি

আমার দিকে মর্মভেদী হাস্য নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ও, বুঝেছি। তারপর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল লক্ষ্মী—হ্যাড়ার দিদি। কম্পিত হাতে একজোড়া মাকড়ি রেবা দেবীর হাতে সমর্পণ করিল। হতভাগিনীর বোধ হয় পৃথিবীতে উহাই একমাত্র সম্বল—স্বল্পবিবাহিত জীবনের একমাত্র স্মৃতি ছিল। ভাইয়ের আবদারে তাহাই বিসর্জন দিয়া গেল। কোনও দান কোনও খাতায় যদি সত্যই লেখা হইয়া থাকে তো, লক্ষ্মীর দান সমস্ত দানকে ছাপাইয়া চিরদিন জ্বলজ্বল করিবে।

সভাভঙ্গের পর নকুড় ও নকুড়-কন্যাকে মোটরে চড়াইয়া দিয়া (হ্যাড়াও সঙ্গে গেল) বাড়ি ফিরিয়া আসিতেই পত্নী কহিলেন, এতক্ষণ কি হচ্ছিল, শুনি? অন্যমনস্কভাবে কহিলাম, কি আবার হবে? ওঁরা ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। পত্নী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, ওঁদের তো ভারি দায় পড়েছে ধ'রে রাখবার, তুমিই ছিলে জোঁকের মত কামড়ে প'ড়ে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ওরা মানে, ওই ধিঙ্গী ছুঁড়ীটা তো? বাক্য বা ভঙ্গীর দ্বারা কোন জবাব না দিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম, এবং পত্নী যে তীব্র দৃষ্টি উদ্যত করিয়া আছেন, সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে পত্নী কহিলেন, এদিকে বাড়িতে একটা কথারও তো জবাব দিতে ইচ্ছে করে না, হাঁড়ির মত মুখ ক'রে ব'সে থাকা হয়, ওদিকে সারাক্ষণ হেসে হেসে কি এত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, শুনি? বক্তিতে তো শুনতে দেখলাম না।

কহিলাম, এই আন্দোলনের কথা বলছিলেন আর কি!

বলছিলেন তো দেখেছি, কি বলছিলেন সেটাই বল না দয়া ক'রে!

আমাকে যোগ দিতে বলছিলেন। উনি নাকি শিগগির জেলে যাবেন। আমাকে বলছিলেন, আসুন না, একসঙ্গে জেলে যাই।

পত্নী সরোষে কহিলেন, হ্যাঁ, তা না হ'লে মজা হবে কেন? সেই-জন্যেই তো বলা হচ্ছিল, আমরা যেন ঘর থেকে পুরুষদের তাড়িয়ে দিই; আমি কি বুঝি নি, কাকে বলা হ'ল? জুতো জামা প'রে ফেরতা দিতে না পারলেও ঘটে বুদ্ধি আছে গো। একেবারে বোকা পাও নি। আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে কি হাসি! মুখে আগুন ওদের!

কহিলাম, ছিঃ, ওসব বলতে আছে! কত প্রশংসা করছিলেন তোমার।

ঝাঁটা মারি প্রশংসার মুখে। মিছিমিছি চুড়িখানা খোয়ালাম। দেবদ্বিজে দিলে ওর চেয়ে কাজ হ'ত।

কহিলাম, খুব ভাল কাজ হয়েছে। সত্যি, দেশের বড় দুর্দিন। এখন আর আরাম ক'রে কারও ঘরে ব'সে থাকা উচিত নয়। যে যতটুকু পারে, কাজ করতে হবে।

দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া স্ত্রী কহিলেন, তার মানে?

মানে, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পত্নী ধমকাইয়া কহিলেন, কাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, খুলে বল না?

কহিলাম, আমাকে এবং আমাকে দেখে আরও অনেককে।

দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া এবং আমার নাকের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া পত্নী কহিলেন, ওসব আশা ছাড়। বুক ফেটে ম'রে গেলেও একটি পা নড়তে দিচ্ছি না। ঝাঁপিয়ে পড়বেন! আর আমি বানে ভেসে এসেছি, না?

যাক, এক দিকে নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু দু দিন পরেই সমস্ত গাঁয়ে একেবারে হিড়িক পড়িয়া গেল। ছোঁড়ার দল আফিং ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতেছে। দেখিতে যাইবার জন্য স্ত্রীর অনুমতি ভিক্ষা করিলাম। অনেক জেরার পর স্ত্রী অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু

খবরদারি করিবার জন্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে দিলেন। যাইয়া দেখিলাম, দোকানটার সামনে লোকে গিসগিস করিতেছে। ঠেলাঠেলি করিয়া সামনের সারিতে দাঁড়াইলাম। পুত্র ভাল না দেখিতে পাওয়ার জন্ত খুঁতখুঁত করিতেছিল, তাহাকে কোলে তুলিতে হইল।

তেনা ও প্যানার সেদিন পালা পড়িয়াছিল। তাহারা হাতজোড় করিয়া ক্রেতাদিগকে না কিনিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছিল, কাহারও পায়ে ধরিতেছিল, কাহারও কাছায় ধরিতেছিল। ক্রেতাদের কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছিল, কেহ বা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল, কেহ বা জোর-জবরদস্তি করিতেছিল, কেহ বা ঠেলাঠেলি করিয়া, হাত ছাড়াইয়া লইয়া, ছুটিয়া গিয়া দোকানে উঠিতেছিল। দর্শকবৃন্দ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। এ রকম তামাশা তাহারা সত্যই জীবনে দেখে নাই। এমন সময়ে 'তফাত যাও, তফাত যাও' বলিতে বলিতে আমাদের গ্রামের বিশু গোঁসাই একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশু যে নামজাদা নেশাখোর, তাহা তাহার চেহারা দেখিলে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। অস্থিকঙ্কালসার দেহ, হাত পা লিকলিকে সরু, পেটটা ধামার মত, চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, গাল ফোলা, মাথার চুল স্বল্প ও পাতলা।

তাহাকে দেখিয়া তেনা ও প্যানা তাহার কাছে আসিতেই বিশু হাত পা নাড়িয়া কহিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না দাদাবাবুরা, ওই ব্যাটাদের আটকাও।—বলিয়া যে লোকগুলা এ সুযোগে সড়াৎ করিয়া পার হইয়া গেল, তাহাদের দিকে হাত বাড়াইল। দেখিয়া প্যানা ছুটিয়া গেল। বিশু বলিল, গাঁজা আমি একদম ছেড়ে দিয়েছি। কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে কহিল, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে পেটিং করব।—বলিয়া সকলের সামনে আসিয়া যুক্তহস্তে বিনাইয়া বিনাইয়া

দর্শকবৃন্দকে আবেদন-নিবেদন করিতে লাগিল, ভাই সব! তোমরা গাঁজা কখনও খাইও না। গাঁজা খাইলে কফ হয়, কাসি হয় ও পেট ধামার মত হয়।—বলিয়া নিজের পেটে হাত দিল। তারপর বলিতে লাগিল, গাঁজা খাইলে জমি বন্ধক পড়ে, বাগান বিক্রি হয় ও পুকুরে গাঁদি লাগে। অতএব ভাই সব, গাঁজা না কিনিয়া ভাল ছেলের মত ঘরে ফিরিয়া যাও। সেদিনকার বাবুটি বলিয়াছেন, তোমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে, মটকা পর্যন্ত আগুন উঠিয়াছে, তাহা না নিবাইয়া এখানে ভিড় করিতেছ কেন?—বলিয়া দুই হাত কোমরে দিয়া, দুই চোখ মুদিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মূর্তিমান জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত দাঁড়াইয়া রহিল; এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে হাসির হররা ছুটিতে লাগিল। ওদিকে প্যানা ও তেনা অন্য দিকে গিয়া খরিদ্দার সামলাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ পোজ পরিত্যাগ করিয়া, পিছন ফিরিয়া, 'ওই যে ব্যাটা, ধর ব্যাটাকে।' —বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া একেবারে দোকানে উঠিল এবং দুই প্রসারিত হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটিকে খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে আবার হাস্যরোল উঠিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র আগুনের মত গরম হইয়া উঠিল, কিন্তু এই মজা ত্যাগ করিয়া দর্শকবৃন্দ এক পা নড়িতে চাহিল না। কিছুক্ষণ পরে 'স'রে যাও বাবারা, ভদ্রলোকের মেয়ে!' বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া একজন লোক ভিন গাঁয়ের এক স্ত্রীলোককে লইয়া সামনে আসিয়া হাজির হইল। স্ত্রীলোকটির সর্বাঙ্গ মোটা চাদর দিয়া ঢাকা, মুখে আবক্ষলম্বী অবগুণ্ঠন, দেখিতে লম্বা-চওড়া ও মোটা।

তেনা আসিয়া স্ত্রীলোকটির সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, মা! আপনি আফিং কিনবেন না। আমি আপনার ছেলের মত, আমার কথা রাখুন। স্ত্রীলোকটি অবনত মুখে নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সঙ্গের লোকটি বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, খাবার জন্যে নয় বাবু, বাড়িতে রুগী, আফিং দিয়ে ওষুধ করতে হবে।

তেনা কহিল, অন্য ওষুধ খাওয়ান মা, ও বিষ আর খাওয়াবেন না।

লোকটি একটু রাগতভাবে কহিল, তুমি তো আর চিকিচ্ছক নও বাপু যে, তোমার কথা শুনতে হবে। দর্শকবৃন্দের দিকে তাকাইয়া কহিল, দেখুন দিকি সব, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মরতে বসেছে ; আজ যায়, কাল যায় ; বলছে, অন্য ওষুধ খাওয়ান ! সব ওষুধই দেওয়া হয়েছে, ও ছাড়া বাঁচানো যাবে না, কবরেজ বলেছে। অনেকে বলিয়া উঠিল, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও। তেনা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু লোকটিও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিতেই বাধা দিয়া কহিল, উনি যান, তুমি যেতে পাবে না। লোকটি মুচকি হাসিয়া কহিল, ভারি লজ্জাবতী কিনা, তাই। আচ্ছা, একাই যাও মা তুমি। স্ত্রীলোকটি দোকান হইতে আফিং কিনিয়া ফিরিয়া আসিতেই লোকটি তাহার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিল। সকলে আশ্চর্য হইয়া দেখিল, নগাঁয়ের দিগম্বর পাল, একমুখ দাড়ি, এক ঝুড়ি গোঁফ, লজ্জার নিদর্শনস্বরূপ জিহ্বাটি নির্গত। দর্শকবৃন্দ আবার হাসিয়া উঠিল।

এমনই করিয়া তামাশা চলিতে লাগিল। স্বাধীনতা লাভের এমন সহজ পন্থা আবিষ্কার করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

রাত্রে পণ্ডিত মহাশয় খবর দিলেন, দারোগাবাবু গ্রামের সকলকে লইয়া মজলিস করিয়াছেন। জেলা হইতে আদেশ আসিয়াছে, যাহারা পিকেটিং করিতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জেলা-শহরে পাঠাইতে হইবে। সেখানে তাহাদিগকে জেলে দেওয়া হইবে। গ্রামের লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। অতএব গ্রামের ছেলেগুলির

সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

পরামর্শ দ্বারা কি স্থির হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, ভীতি-প্রদর্শন ও প্রয়োজন হইলে প্রহার।

কহিলাম, ন্যাড়া কোথায় বলুন তো?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, ন্যাড়া কি গাঁয়ে আছে নাকি মশায়! দিন নেই, রাত নেই, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সেবক সংগ্রহ করছে। সারা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিলে হতভাগা! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পারেও তো! ভোঁদা নাকি বাড়িতে বলেছে, সব দিন খাওয়া পর্যন্ত জোটে না—কোনদিন একমুঠো মুড়ি, কোনদিন পান্তাভাত, ঘর না পেলে গাছতলাতেই রাত কাটিয়ে দেয়। সৎপথে থাকলে ছেলেটা মানুষ হ'ত, মা-টার অদৃষ্ট! কহিলাম, দারোগাবাবু ওকে ধরছেন না?

পণ্ডিত চোখ মটকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ধরবেন, ধরবেন, এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমাদের মত তো নয় যে, ফাতনা নড়লেই খাই মারবেন? ওস্তাদ লোক, খেলিয়ে খেলিয়ে টেনে তুলবেন এখন।

পরদিন শুনিলাম, তেনা ও প্যানাকে হাতকড়ি পরাইয়া থানায় লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে পণ্ডিত মহাশয় আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তেনা-প্যানাকে ধরেছে বুঝি?

পণ্ডিত কহিলেন, ধরেছিল, ওদের বাবারা মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। ছেলেগুলোও নাকখৎ দিয়ে আর কিছু করবে না বলেছে।

বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, তাই নাকি?

পণ্ডিত স্ফূর্তি সহকারে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাত পা বেঁধে এক পাল ক'রে কেয়ো গায়ে ছেড়ে দিতেই কি চীৎকার! কোথায় ভারতমাতা

আর গান্ধীদাদা! ঘরের বাপ-মার নাম ক'রে হাঁকডাক করতে লাগল। শেষে ছেড়ে দিতেই নাক দিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সারা মেঝে চ'ষে দিতে লাগল।

প্রশ্ন করিলাম, আপনার ভোঁদা কি করছে?

কহিলেন, কাল বোধ হয় যুদ্ধে যাবেন, তা ব'লে দিয়েছি, কোলা-ব্যাঙের ব্যবস্থা করতে।

কেন?

বীরপুঙ্গব কোলাব্যাঙ দেখলেই তিড়বিড় ক'রে লাফাতে থাকেন। গণ্ডা কয়েক কোলাব্যাঙ গায়ের ওপর লাফাতে শুরু করলেই দেশোদ্ধারের বাতিক দেশ ছেড়ে পালাবে।

এমনই করিয়া গ্রামের ছেলেগুলি একে একে ঘরে ফিরিল, কিন্তু ভিন্ন গ্রাম হইতে যাহারা আসিল, তাহারা এত সহজে দমিল না। তাহাদিগকে ধরিয়া বাসে চাপাইয়া জেলা-শহরে পাঠানো হইতে লাগিল, এবং বিচারে কাহারও এক মাস, কাহারও দুই মাস জেলের ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

দিন দশ পরে। বিকালবেলা হইতে ঝড় ও বৃষ্টি নামিল এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমানে চলিতে লাগিল। কাজেই সে রাত্রে পণ্ডিত মহাশয় আসিলেন না। পরদিন সকালবেলায় খবরের জন্য মনটা উসখুস করিতেছিল, এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় হাস্যবিকশিত মুখে উদিত হইলেন। কহিলেন, শুনেছেন খবর? ধাড়ী কাতলা যে ধরা পড়েছে! সাবাস বুদ্ধি! এমন না হ'লে সরকার দারোগা করে? বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কি ব্যাপার? পণ্ডিত হাত নাড়িয়া কহিলেন, স্থাড়া ধরা পড়েছে মশায়। কাল রাত্রে দলবল নিয়ে আফিঙের দোকানের তালা ভেঙে চুরি করছিল, একেবারে বামাল সমেত ধরা পড়েছে, এবার বাছাধন বুঝবেন মজাটা।

কহিলাম, কোথায় রেখেছে ন্যাড়াকে ?

রাখবে আবার কোথায় ? শেষ রাত্রেই বিদেয় ক'রে দিয়েছে।

রাত্রে বাস কোথায় ?

পণ্ডিত খ্যাঁকাইয়া কহিলেন, বাসের কি দরকার ? চোর। চোরের মত হাতকড়ি পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে রুলের গুঁতো মারতে মারতে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে।

এই দৃশ্য কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইয়া পণ্ডিতের সমস্ত দেহ যেন নাচিতে লাগিল। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া, দুই চোখ ছোট করিয়া, হাত দিয়া বাতাসে ঘুষি মারিতে মারিতে কহিলেন, গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে দিক হতভাগার পাঁজরা ভেঙে, মাথার ঘিলু দিক বের ক'রে, তবে হতভাগা জব্দ হবে। বাবা! ইংরেজের সঙ্গে চালাকি! সারা দুনিয়াটা শাসন করছে, তুই তো একটা নেংটি ইঁদুর।—বলিয়া কড়ে আঙুলটি প্রসারিত করিয়া বাক্যের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিলেন।

কহিলাম, ন্যাড়া চুরি করেছে, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে ?

পণ্ডিত আমার কথার জবাব না দিয়া কহিলেন, আপনার হচ্ছে না বুঝি ? যান, দারোগাবাবুকে বলুনগে।

তাড়াতাড়ি কথাটা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া কহিলাম, পাগল! আমি কি তাই বলছি! বলছি, ন্যাড়া এ রকম ছিল না।

সঙ্গদোষ মশায়, সঙ্গদোষ। সেদিনকার নমুনা দেখলেন তো। সঙ্গদোষে সবই সম্ভব। নইলে আমার ভোঁদা, যার পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, সেই দিনকতক বিগড়ে গেল!—বলিয়া দুই যুক্তহস্ত কপালে ঠুকিতে লাগিলেন। কহিলাম, ও কি হচ্ছে ? কহিলেন, প্রণাম করছি দারোগা-বাবুকে, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যাই একবার গাঙুলী মশায়ের কাছে।—বলিয়া পণ্ডিত প্রস্থান করিলেন।

বাড়ির মধ্যে খবর দিবার জন্য প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, বারান্দায় ন্যাড়ার মা বসিয়া আছেন। চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে, গালে অশ্রুর দাগ এখনও শুকায় নাই। পত্নী গালে হাত দিয়া বিস্ফারিত চক্ষে বসিয়া আছেন। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই পত্নী কহিলেন, শুনেছ? ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

কোন উপায় নেই?

নিরুত্তর রহিলাম। পত্নী কহিলেন, মাথায় বজ্রাঘাত হবে। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কার? তীক্ষ্ণকণ্ঠে পত্নী কহিলেন, ওই গাঙ্গুলী বুড়োর। ওই মুখপোড়ার পরামর্শেই তো এত কাণ্ড! চুপ করিয়া রহিলাম। ন্যাড়ার মা ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন, শেষরাত্রে একটি ছেলে এসে আমাকে ওঠালে। ওরা নাকি জনকয়েক ছেলে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ কতকগুলো পুলিসের লোক ওদের ঘেরাও করে। তাদের হাতে বড় বড় লাঠি ছিল, তাই একটা কেড়ে নিয়ে ন্যাড়া ওর সঙ্গীদের পালিয়ে যেতে ব'লে একা যুঝতে লাগল। একা অতগুলো লোকের সঙ্গে কতক্ষণ পারবে? শেষে ধরা পড়ল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, খবর পেয়েই লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে একা থানাতে গেলাম। দেখি, একটা খুঁটিতে পিছমোড়া ক'রে বাছাকে আমার বেঁধে রেখেছে। দারোগা-বাবুকে কত বললাম, পায়ে ধরলাম, অপমান ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাছা আমার আর ফিরবে না বাবা?

পত্নী সাহস দিয়া কহিলেন, কেন ভাবছেন কাকীমা? ইংরেজের রাজত্ব হ'লেও এত অবিচার হবে? বিনাদোষে শাস্তি দেবে?—বলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। আমি জবাব দিলাম না। পত্নী কহিলেন, কালই আপনার ছেলেকে আমি পাঠিয়ে দোব। উনি ন্যাড়াকে ফিরিয়ে আনবেন, আপনার কিছু ভয় নেই।

পরদিন সকালে ন্যাড়ার মা আসিয়া কহিলেন, বাবা, আজ কি যাবে? কহিলাম, হ্যাঁ। একটু ইতস্তত করিয়া ন্যাড়ার মা চারিটি টাকা আমার হাতে দিয়া কহিলেন, এর বেশি আর পারলাম না বাবা। তোমাকে বেশি কি আর বলব, যা করবার ক'রো, বাছাকে যেন ছেড়ে দেয়।

কহিলাম, যা করবার কিছু ত্রুটি হবে না। তবে আপনার অদৃষ্ট।

প্রচুর আশীর্বাদ করিয়া ন্যাড়ার মা প্রস্থান করিলেন। এমন সময়ে পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা দেখিয়া কহিলেন, ও কি? কহিলাম, ন্যাড়ার মা দিয়ে গেলেন। পত্নী কহিলেন, আর তুমি হাত পেতে নিলে? কথাটার বক্র গতি দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পত্নী কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ঝাঁজালো কণ্ঠে কহিলেন, তোমার লজ্জা করল না? পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এল, আর তুমি স্বচ্ছন্দে সেই টাকা নিলে? কহিলাম, কোথায় পাব টাকা?

পত্নী ভ্যাংচাইয়া কহিলেন, কোথায় পাব টাকা? যদি তোমার নিজের ছেলেকে ধ'রে নিয়ে যেত, কোথায় পেতে টাকা? কহিলাম, নিজের ছেলে—। বাধা দিয়া পত্নী কহিলেন, ওরাই কি তোমাদের পর? তোমরা ব'লে ন্যাড়ার মাকে দাসীবিত্তি করতে দিয়েছ, মানুষের মত মানুষ হ'লে দিতে না। কেন, দেখ নি আমার বাবার বাড়িতে? দিন পঞ্চাশজন আত্মীয় পাত পাড়ছে যে।

জবাব দিলাম না। মনে মনে কহিলাম, মাস্টারি না করিয়া তোমার বাবার মত যদি জমিদারের নায়েবি করিতাম তো অনাথাশ্রম খুলিয়া দিতাম।

পত্নী বড় মেয়েকে ডাক দিয়া কহিলেন, টুনী, ন্যাড়ার মাকে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আয়। টাকা আমি দোব। বাবা আম-কাঁঠালের

জন্যে দশ টাকা পাঠিয়েছেন। কি হবে সেই টাকায়? তুমি নিয়ে যেও।

বিকালবেলায় শহরে পৌছিয়া প্রথমে কংগ্রেস-আফিসে দেখা করিতে গেলাম। একটা সরু গলির মধ্যে ছোট একটা দোতলা বাড়ি। দরজার মাথায় কেরোসিন কাঠের তক্তায় আলকাতরা দিয়া লেখা ছিল, স্বরাজ হোটেল। দরজা অর্ধোন্মুক্ত ছিল; মুখ বাড়াইতেই দেখিতে পাইলাম, সামনের বারান্দায় মোড়ার উপর বসিয়া একজন ঢ্যাঙাপানা লোক যুক্তমুষ্টি অধরোষ্ঠে চাপিয়া রাখিয়া উর্ধ্বমুখে মুদ্রিত নয়নে বোধ করি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেছে, এবং অদূরে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া আর একজন লোক বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের কনুই ন্যস্ত করিয়া ও দক্ষিণ হস্ত অর্ধপ্রসারিত করিয়া ক্ষুধার্ত নয়নে প্রথম লোকটির দিকে তাকাইয়া আছে। সহসা গাঢ় কুণ্ডলায়মান ধূমে চারিদিক ছাইয়া গেল। দ্বিতীয় লোকটা দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ-প্রসারিত করিতেই প্রথম লোকটা কড়া গলায় কহিল, দাঁড়া ব্যাটা, কুলকুণ্ডলিনী আগে জাগ্রত হোক।—বলিয়া পুনরায় সমাধিস্থ হইল। দ্বিতীয় লোকটা দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া কাঁচুমাচু মুখে কহিল, শুকনো কাঠ হয়ে গেল যে!

একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কংগ্রেস-আফিস কোথায় বলতে পার? দ্বিতীয় লোকটা মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত মুখে কহিল, দোতলায়।

পার্শ্বের অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া দোতলার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা বন্ধ। একটু ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গেল, কিন্তু সভয়ে পিছাইয়া আসিলাম, মনে হইল, এক হাজার গোখরো সাপ একসঙ্গে গর্জন করিতেছে।

কংগ্রেস-আফিসে সাপ! ইংরেজ তাড়াইবার জন্য ইহারা সাপ

পুষিতেছে নাকি! খাঁটি স্বদেশী প্রথা নিশ্চয়ই! কিন্তু হঠাৎ চটাস করিয়া শব্দ হইতেই গর্জন বন্ধ হইয়া গেল, তারপর কাসির শব্দ; তবে সাপ নয়! দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ঘর অন্ধকার, সব দরজা জানালা বন্ধ, একটানা ঘর্ঘরধ্বনি ঘরের পরিমিত ও রুদ্ধ বাতাসকে মথিত করিতেছে। একটা জানালা টানিয়া খুলিতেই বুঝিলাম, ইহাই আদি ও অকৃত্রিম কংগ্রেস-আফিস। ইহার মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে সর্বত্র বঙ্গমাতা নিজ করতলের ছাপ আঁকিয়া স্বকীয়ত্ব ঘোষণা করিতেছেন। সারা মেঝে ঢাকিয়া বাংলার তৈয়ারি ছেঁড়া মাছুর ও চাটাই, এবং তাহার উপর আধ ইঞ্চি পুরু বাংলার মাটির খাঁটি ধূলা। বাংলা দেশের কারখানার তৈয়ারি আধপোড়া বিড়ি ইতস্তত ছড়ানো, এবং সারা দেওয়াল ব্যাপিয়া বঙ্গমাতার সেবকবৃন্দের মুখনিঃসৃত থুতু ও কফের দাগ। ছাদে ও কোণে বঙ্গদেশীয় মাকড়সার তৈয়ারি জাল পুরু হইয়া ঝুলিতেছে। এবং ওই যে বিশালকায় ব্যক্তি স্খলিত বসনে চিত হইয়া ঘুমাইতেছেন এবং যাঁহার ভুঁড়িটি একটি বৃহৎ হাপরের মত আন্দোলিত হইতেছে, উনি যে বঙ্গমাতার একজন চিহ্নিত সেবক, তাহা উঁহার চটের মত মোটা ও মলিন খদ্দরের কাপড় দেখিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার সাধ্য নাই।

দুই কানে আঙুল দিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কি অসামান্য সাধনা, অথচ কি অপর্যাপ্ত অপচয়! যে বিপুল বন্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে সারা দেশের মাটি উর্বর হইয়া উঠিত, তাহা কেবল দুই তীরকে প্লাবিত ও পর্যুদস্ত করিতেছে। অথবা ইহাই বোধ হয় এ দেশের ভাগ্যলিপি! না হইলে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দিয়া বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত রোদে পুড়িয়া পিকেটিং করাইবার এবং নেতাদের রাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা মুখস্থ করিবার কি দরকার? তেত্রিশ কোটি

লোকের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া যদি অন্তত তেত্রিশ হাজার সিঙ্ঘনাশা মহাপুরুষ একত্র করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের গর্জমান নাসিকার সম্মুখে ভারতের মুষ্টিমেয় ইংরেজ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে ?

হঠাৎ পটাস করিয়া শব্দ হইল, এবং একটি মাছির মৃতদেহ নিদ্রিতের গাল হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িল। সমুদ্রকল্লোল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল। এই সুযোগে হাঁকিয়া কহিলাম, মশায়, শুনছেন ?

নিদ্রাকলুষ দুই রক্তবর্ণ চক্ষু অর্ধোন্মীলিত করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, কে ?—বলিয়া নিম্ন-ভারাক্রান্ত রবারের পুতুলের মত অবলীলাক্রমে উঠিয়া বসিলেন।

কহিলাম, নকুড়বাবু কোথায় ?

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জবাব আসিল, নকুড়বাবুর কি দরকার ? আমি রয়েছি কি জন্যে ?

কহিলাম, আপনি—

হ্যাঁ, আমি। আমি জেলা-কংগ্রেসের কর্মসচিব কালান্তক কানুনগো। জেলার সমস্ত কাজের ভার আমার হাতে।—বলিয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিলেন।

স্যাড়াসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ খুলিয়া বলিলাম। নিরাসক্তকণ্ঠে কালান্তকবাবু জবাব দিলেন, বেশ তো ! এতে করবার কি আছে ?

ওর মা কান্নাকাটি করছেন।

কালান্তকবাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, কান্নাকাটি করছেন ? পর-মুহূর্তেই কণ্ঠ কঠোর, দৃষ্টি কুটিল এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, বিধবার কান্নাকাটিই শুনতে পাচ্ছেন, আর মায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছেন না ?

বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, মা ? কার মা ?

কার মা? আমার মা, আমাদের মা, তেত্রিশ কোটি ভারত-সন্তানের মা—ভারতমাতা। সহসা দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মস্তক হেলাইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তির্যকভাবে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, ওই শুনুন মায়ের কান্না।

তর্জনীনির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিলাম, কোণে মাকড়সার জালে সন্তধৃত জনৈক মাছি করুণ আর্তনাদ করিতেছে।

কহিলাম, ও তো মাছি।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, ঘন ঘন মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে কালান্তক কহিলেন, মাছি নয়—মাতা, মাকড়সার জাল নয়—ইংরেজের পাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল; আপনি অন্ধ।

প্রতিবাদ না করিয়া ভূমিতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। ডজন কয়েক মাছির মৃতদেহ ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, জালে বসিলেই ভারতমাতা, গালে বসিলেই মাছি।

কহিলাম, মায়ের একমাত্র ছেলে—

উত্তর আসিল, হ'লেই বা একমাত্র ছেলে! মহাভারত পড়েছেন? অভিমন্যুর মায়ের ক ছেলে ছিল মশায়? রেহাই পেয়েছিল কি?

নিজের বুক চাপড়াইয়া কহিলেন, আর আমি? আমিও মায়ের এক ছেলে। তবু, মা বাবা স্ত্রী পরিজন, প্র্যাক্টিস, (দেওয়ালের কাছে একটি ছোট বাক্স দেখিয়া বুঝিলাম, ইনি হোমিওপ্যাথী ডাক্তার) একঘর ছেলে-পিলে, একগাঁ রুগী ছেড়ে এখানে যে প'ড়ে আছি, কিসের জন্যে? মায়ের পায়ে এই তুচ্ছ প্রাণটাকে (নিজের কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন) বলি দেবার জন্যে। ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া কহিলেন, মায়ের একমাত্র ছেলে!

ঘাবড়াইয়া গিয়া আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, তবু একটা কিছু করা দরকার। উকিল-টুকিলদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ—

বজ্রনাদ করিয়া কালান্তক কহিলেন, কি ? আমরা উকিল দোব ? ইংরেজের আদালতে তাদের নোকরদের সামনে গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে 'ধর্ম্মাবতার !' বলব আমরা ? বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না ? কিছুক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিসের ভয় করছেন আপনি ? জেল ? মহাত্মা গান্ধী জেলে, বড় বড় নেতারা জেলে, সারা দেশের স্ত্রী-পুরুষ জেলে, আমরা জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর আপনি ভয় করছেন জেলের ?

একটু দম লইয়া কহিলেন, আপনি নিজে কোথায় বলুন দেখি ? আপনিও জেলে। সারা ভারতবর্ষ একটা বিরাট জেলখানা। আপনার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন দিকি ? কি দেখছেন ? শেকল, আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার শেকল ; একটু উঠে দাঁড়ান দিকি, ঝনঝন ক'রে উঠবে।

বাধা দিয়া কহিলাম, কিছু করবার নেই তা হ'লে ?

না, পিকেটিং করতে চান তো থাকুন এখানে। হোটেলে খান, এখানে শোন। না হয় সোজা বাড়ি গিয়ে বিধবাকে কান্না থামাতে বলুনগে।

ইহাদের কাছে কোনও কাজ পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া চলিয়া আসিয়া সটান একজন উকিলের বাড়ি গিয়া উঠিলাম। উকিল মহাশয় চেয়ারে প্রায় চিত হইয়া, টেবিলে পা চাপাইয়া, সর্বাঙ্গে খবরের কাগজ চাপা দিয়া বসিয়া ছিলেন। পদশব্দ শুনিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, কে ?

কহিলাম, আমি।

ও, মক্কেল ! তা হ'লে বসুন।—বলিয়া পার্শ্বের বেঞ্চিটা দেখাইয়া দিয়া কাগজ টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া উকিলবাবু পা নামাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কেস ? কেউ ডোবাচ্ছে, না কাউকে ডোবাতে চান ?

কহিলাম, আজ্ঞে না, স্বদেশী কেস।

স্বদেশী বিদেশী বুঝি না; কেসটা কি খুলে বলুন দিকি?

খুলিয়া বলিতেই উকিলবাবু কহিলেন, ও চুরি! তা এখন এখানে কেন? মোক্তারের কাছে যান। জামিনে খালাস করুন। তারপর ঠিক সময়ে খবর দেবেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই উকিলবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমার ফীটা কে দেবে?

কহিলাম, ফী? দেশের কাজে—

উকিলবাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেশের কাজে? আপনারা কি ভাবেন, স্বরাজ হ'লে উকিল-মোক্তারের অন্ন উঠে যাবে?

কহিলাম, কিছুই তো করলেন না, তবু ফী?

উকিলবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, করলাম না? বেঞ্চিতে বসতে দিলাম, পরামর্শ দিলাম, এতখানি সময় নষ্ট করলাম, তার দাম কে দেবে? কি করেন আপনি? মাস্টারি বুঝি?

ঠিক চিনিয়াছে দেখিতেছি। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

উকিল লম্বভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাইতেই এই বুদ্ধি! হাত বাড়াইয়া ধমক দিয়া কহিলেন, দিন দিন, ফী দিন। অগত্যা পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিতেই উকিলবাবু টাকাটি টেবিলের উপরেই ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, এক টাকা না, দু টাকা।—বলিয়া সবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি জানি, হয়তো ছিনাইয়া লইবে—এই ভয়ে আর এক টাকা নামাইয়া দিয়া এবার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্থানত্যাগ করিলাম।

পরদিন সকালে একজন মোক্তারের খোঁজ করিবার জন্য কাছারিতে হাজির হইলাম। চারিদিকে লোকে গিসগিস করিতেছে, এবং পোশাক

আঁটিয়া উকিল ও মোক্তারের দল কাজে ও বিনা কাজে তাহাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া খরিদ্দার সংগ্রহ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কাছে গেলে সস্তায় কাজ সারিতে পারিব স্থির করিতে না পারিয়া এক পার্শ্বে বিহ্বলনয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, একজন লোক মরি-কি-মারি করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া তাহার গন্তব্য পথের নিকটবর্তী হইতেই লোকটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রশ্ন করিল, মশায়! অঘোরবাবু কোথায় জানেন? হাঁ কি না, জবাব দিতে না দিতেই লোকটা কহিল, জানেন না? হায় হায়! ওদিকে হাকিম মামলা ধরেছে, ইদিকে বেটা উকিল টাকা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।—বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল।

একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্ফল ভাবিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেখিলাম, এক স্থানে পুরা নহে, পৌনে-প্যাণ্ট ও তৈলচিক্কণ কালো আলপাকার পৌনে-হাতা কোট পরিয়া একজন মধ্যবয়সী মোটা ও বেঁটে লোক; খুব সম্ভব মোক্তার, একজন মক্কেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতেছে। মোক্তার বলিতেছে, আট দিনে পাঁচ আষ্টে চল্লিশ টাকার চুক্তি, তিরিশ টাকা দিয়েছিস, আরও দশ টাকা দিতে হবে, এক পাই-পয়সা কম হ'লে চলবে না। মক্কেল কহিতেছে, জিতলে তো সবই দিতাম। হেরে গেলাম যে!

হারলেই বা! হার জিত কি আমার হাতে? খাটতে কসুর করেছি দেখেছিস?

এজ্ঞে, খেটেছেন বইকি। তবু—

ধমকাইয়া মোক্তার কহিল, আবার তবু! নিজে তো খাড়া দম দাঁড়িয়ে ছিলি, বক্তিমে তো নিজের কানে শুনেছিস! কি রকম বক্তিমে! হাকিমের ভাগ্যি ভাল কড়িকাঠ চাপা পড়ে নি। এততেও

যে হারলি, সে কি আমার দোষ? তোর নিজের অদেষ্ট! দে বেটা, টাকা দে।

মক্কেল কোমর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে আমাকে রেহাই দেন বাবু। আর কিছু নেই আমার।

মোক্তার তাড়াতাড়ি তাহা পকেটস্থ করিয়া কহিল, সত্যি বলছিস? কিচ্ছু নেই? কাছাতে? বামুনকে ঠকাস নি বেটা! উচ্ছন্ন যাবি তা হ'লে।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়িতেই কহিল, তুমি কে হে? ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? কি দরকার তোমার?

বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে, মোক্তারের—

মোক্তারের দরকার তো, হাবাকান্তের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? গড়গড় ক'রে চ'লে এস না কাছে। মাখন মোক্তারের নাম শোন নি? আমিই মাখন মোক্তার।

কাছে যাইতেই মোক্তার কহিল, কি কেস?

কহিলাম, স্বদেশী—

মাখন পুলকিত হইয়া কহিল, স্বদেশী? তবে বাপু ঘুরঘুর করছিলে কেন? সটান চ'লে আসতে পার নি? সমস্ত কাছারিতে এক মাখন মোক্তারই শুধু কংগ্রেসের লোক, খাঁটি স্বদেশী।—বলিয়া পটাপট জামার বোতাম খুলিয়া খদ্দরের ফতুয়া টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, এই দেখ খদ্দর—জাপানী নয়, আসল। তা বাপু, কেসটা কি?

সমস্ত শুনিয়া মাখন মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, চুরির কেস। শক্ত ব্যাপার। অনেক টাকার জামিন লাগবে। একশো টাকার কমে কোন মোক্তারই রাজি হতে চাইবেন না, তবে আমার কথা ছেড়ে দাও।

দেশের কাজে জীবনই দোব ঠিক করেছি তো সামান্য টাকা। গোটা পঞ্চাশ দিলেই হবে। কত টাকা আছে সঙ্গে?—বলিয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি আমার বুক-পকেটের দিকে নিক্ষেপ করিল। আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, টাকা তো আনি নি। বিস্মিতকণ্ঠে মাখন কহিল, টাকা আন নি? কিচ্ছু না? ঘাড় নাড়িলাম।

ক্রুদ্ধস্বরে মাখন কহিল, টাকা আন নি তো এসেছ কিসের জন্যে? যাও, খ'সে পড়।

কহিলাম, আপনি কংগ্রেসের লোক—

কড়া গলায় মাখন কহিল, হ্যাঁ, কংগ্রেসের লোক, একশো বার কংগ্রেসের লোক। তা ব'লে বিনা পয়সায় মকদ্দমা চালানো মাখন মোক্তারের কুষ্ঠিতে লেখে নি। ইতিমধ্যে মাখনের মক্কেল কাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই, ওরে অই বেটা, পালাচ্ছিস কোথায়? শোন্ শোন্।—বলিতে বলিতে মাখন দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

আরও অনেকগুলি কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মোক্তারের সহিত দেখা হইল। কিন্তু কোটের নীচে ছেঁড়া খদ্দরের ফতুয়া ছাড়া আর কোনও বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য দেখিলাম না। সকলেই প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিল, কেস চালাইতে হইলে কমপক্ষে এক শত টাকার কম হইবে না—স্বয়ং ভারতমাতা আসিলেও না। কিন্তু এত টাকা কি করিয়া সংগ্রহ করিব? ন্যাড়ার মায়ের ভিটাটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই; আর আমি তো স্কুল-মাস্টার। মাস্টারী-জীবনে আর যা-কিছুরই প্রাচুর্য থাক্, অর্থের থাকে না। তা ছাড়া আমার সাংসারিক বুদ্ধি অনুক্ষণ এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল যে, এসব হাঙ্গামা করিও না; জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিবার দুর্মতি ছাড়। অতএব

ন্যাড়ার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

একজন নবোদ্গত-পক্ষ মোক্তারকে দিয়া স্বল্পব্যয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল।

ন্যাড়া আসিয়া নমস্কার করিল। কহিলাম, কেমন আছিস?

ন্যাড়া হাসিয়া কহিল, সরকারের অতিথি, আছি ভালই। আপনারা ভাল আছেন? পিকেটিং চলছে?

ঘাড় নাড়িয়া দুই প্রশ্নেরই জবাব দিলাম।

ন্যাড়া কহিল, আপনিও আসুন।

কথাটায় কান না দিয়া তাহার জামিনের কথা পাড়িলাম। ন্যাড়া সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কি হবে দিন কয়েকের জন্যে বাইরে গিয়ে? জেল আমাদের হবেই। তা ছাড়া আমি তো একা নয়।

মানে?

আমাদের অনেককেই ধরেছে যে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যাড়া কহিল, জেলের ভয় আমাদের নেই। সারা দেশটাই একটা বড় জেলখানা। আমাদের ভয় কি জানেন?—পাছে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়!

বাধা দিয়া কহিলাম, কাকীমা কান্নাকাটি করছেন।

ন্যাড়া কহিল, মা! মা কি আমার জন্যে কাঁদছেন? আমি ভবিষ্যতে সাহেবের চাকরি ক'রে যে সংসার পেতে দিতে পারতাম, সেই ভাবী সংসারের জন্যে কাঁদছেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাদের মা-বোনরাই আমাদের প্রবল বাধা। অথচ এরা দেবী! আমাদের দেশেরই তো মেয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে রাজপুত মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে যুদ্ধের সাজ পরিয়ে দিত, হাসতে হাসতে চিতায় প্রাণ দিত, তাদের চেয়ে এক তিল কম নন। আমার মনে হয়—

বাধা দিয়া কহিলাম, তোর মাকে কিছু বলতে হবে?

ন্যাড়া কহিল, কি আর বলবেন? বলবেন, ভাল আছি।

বিচারে ন্যাড়াদের তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। চুরি প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীর অভাব হইল না। ন্যাড়ার দলেরই জনকয়েক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুইজন প্রজা ন্যাড়াকে স্বচক্ষে দরজা ভাঙিতে দেখিয়াছে বলিল, এবং স্বয়ং দোকানদার ন্যাড়া ও তাহার সঙ্গীদের অপরাধী বলিয়া সনাক্ত করিল। ন্যাড়ার মা দিনকয়েক কান্নাকাটি করিলেন। তারপর যেমন করিয়া স্বামীর মৃত্যু ও কন্যার বৈধব্যকে বহন করিতেছেন, তেমনই নিঃশব্দে পুত্রের বিচ্ছেদব্যথাকে বহন করিতে লাগিলেন।

তিন বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া নেতারা আইন-মান্য আন্দোলন শুরু করিলেন। স্বরাজ সমুদ্র-পার হইতে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইল না। গাঁজা ও আফিঙের বিক্রয় চারগুণ বাড়িয়া গেল; বিলাতী সিগারেট ও বিলাতী সুতার ধুতি পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতমাতা ভারতসমুদ্রে হাঁটুজল না পাইয়া আত্মহত্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া সবরমতী আশ্রমে আশ্রয় লইলেন।

ন্যাড়ার মা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হ্যাঁ বাবা, আর কতদিন আছে? বাছা আমার কবে ফিরবে? সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম, আবার কি কাকীমা! আসবার সময় হয়ে এল প্রায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় ন্যাড়ার মা আসিয়া একটা সরকারী চিঠি হাতে দিয়া কহিলেন, এই চিঠিটা আজ এসেছে। বোধ হয় ন্যাড়ার চিঠি। দেখ দিকি বাবা, কি লিখেছে!

পড়িতে লাগিলাম। ন্যাড়ার মা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা, আসবে তো?

কহিলাম, আসবে।

ভাল আছে তো?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না। অসুখে ভুগছে, দুর্বল। এখান থেকে কাউকে গিয়ে আনতে হবে।

ন্যাড়ার মা বিবর্ণমুখে কহিলেন, অসুখ করেছে? আনতে যেতে হবে? কে যাবে বাবা?

ইতিমধ্যে পত্নী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহস দিয়া কহিলেন, ভয় কি কাকীমা! উনি যাবেন। চিকিচ্ছেপত্র যা করাতে হয়, সব উনি করবেন। কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে গিয়া ন্যাড়ার কথা জানাইয়া ছুটি চাহিলাম। গাঙ্গুলী মহাশয় চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই তো হে, ছোঁড়া আবার ফিরে আসছে! আবার গোলমাল করবে না তো? কহিলাম, পাগল হয়েছেন! আন্দোলনই বন্ধ হয়ে গেছে। ও একা কি করবে?

একা আর কই ভায়া? সাঙ্গোপাঙ্গ জুটতে কতক্ষণ? দেখ নি, সেবার কি রকম ক'রে তুলেছিল? সবাই মিলে এক রকম ক'রে থামানো গেল তাই, কিন্তু বুদ্ধি বটে দারোগাবাবুর! ও রকম দারোগা আর দেখলাম না, প্রাতঃস্মরণীয় লোক। জবাব দিলাম না। গাঙ্গুলী কহিলেন, ছোঁড়ার খুব অসুখ করেছে, বলছ না? তা হ'লে সরাসরি আর গাঁয়ে এনে দরকার? চিকিচ্ছেপত্র যা করাতে হয়, জেলাতেই করিও। সারে তো আর উপায় কি, আর না সারে তো—

বাধা দিয়া কহিলাম, শহরে থেকে চিকিচ্ছে করাবার পয়সা কই?

গাঙ্গুলী কহিলেন, কেন? ভিটেটা কি মাগীর পরকালে সাক্ষী দেবে? বাঁধা দিক, আমি টাকা দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া

স্কুলের কথা পাড়িলাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে কাজকর্মের ব্যবস্থা-বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি নয়টার সময়ে বাড়ি ফিরিবার পথে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এই যে দাদা! তোমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছি। কহিলাম, সে কি দিদিমা! আমার পথ চেয়ে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কেন? হুকুম হ'লে নিজেই কুঞ্জে গিয়ে হাজির হতাম যে। দিদিমা কহিলেন, ঘরে অমন চাঁদপানা বউ, বুড়ী দিদিমার হুকুম কি আর কানে ঢুকবে ভাই? কিন্তু যাকগে, তুমি কি কালই যাচ্ছ?

কহিলাম, হ্যাঁ।

ন্যাড়ার অসুখ কি খুব বেশি?

চিঠি প'ড়ে তাই মনে হ'ল। একা আসতে পারবে না।

ওই হতভাগীটাকেও নিয়ে যাও, বলা তো যায় না। তারপর অঞ্চল-প্রান্ত হইতে একখণ্ড কাগজ খুলিয়া আমার হাতে দিয়া কহিলেন, পঞ্চাশটি টাকা দিচ্ছি, ছোঁড়ার চিকিচ্ছেপত্তর করিও। দরকার হ'লে আরও দোব আমি। কিন্তু কাউকে বলতে পাবে না দাদা, নাতবউকে পর্যন্ত না।—বলিয়া স্বগৃহোদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে একটা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া জেলখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ফটকের সামনে হাজির হইলাম। প্রায় এক শত বিঘা জমি জুড়িয়া বিরাট জেলখানা; চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। বন্দুকধারী পশ্চিমা রক্ষীর কড়া পাহারায় কোথাও কাক-পক্ষী পর্যন্ত বসিবার জো নাই। ইহার মধ্যে শত শত মানুষ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আইন ভঙ্গ করিয়া দিনের পর দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; এবং ওই পশ্চিমা রক্ষীগুলা দৈহিক, ও উহাদের প্রভুরা মানসিক শক্তি

প্রয়োগে হতভাগ্যদের প্রায়শ্চিত্ত ত্রুটিহীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। জেলখানা নরকের ঐহিক সংস্করণ।

পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ন্যাড়াদের বাহির হইবার সময় হইল। কিছুক্ষণ পরে কতকগুলা ছেলে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা কাহাকে, বোধ হয় ন্যাড়াকে, ধরিয়া ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাছে আসিতেই আমার অনুমান সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

কিন্তু ন্যাড়াকে দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। তেমন ফরসা রঙ কালো হইয়া গিয়াছে, এবং পেশীবহুল শক্তিমান ঋজু দেহে অস্থিকঙ্কাল-সার ও কুব্জ হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। চোখ দুইটি কোটরে ঢুকিয়াছে এবং মাংসহীন বিবর্ণ মুখের মধ্যে শীর্ণ নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিল, দাদা, এসেছেন!—বলিয়া প্রণাম করিতে গেল, আমি তাহাকে বাধা দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলাম, থাক্ থাক্, কি হয়ে গিয়েছিস? চিনতে পারা যায় না যে! একটি ছেলে কহিল, খুব অসুখ হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। গায়ে হাত দিতেই ন্যাড়ার জ্বরতপ্ত দেহের স্পর্শে আমার হাতটা যেন পুড়িয়া গেল। কহিলাম, জ্বর এখনও রয়েছে যে! ন্যাড়া নিজেকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আছেই তো। কিন্তু আর থাকবে না দাদা। মায়ের কোলে ফিরে এলাম, এবার আমি ভাল হয়ে যাব। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল, এই ফাঁকা ময়দান, খোলা আকাশ কতকাল দেখি নি মনে হচ্ছে।—বলিয়াই কাসিতে কাসিতে বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমি কহিলাম, থাক্, এখন আর কথা ব'লে কাজ নেই। চল্, গাড়িতে চল্।—বলিয়া আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠাইলাম।

ট্রেনে সমস্ত রাস্তা ন্যাড়া নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, দাদা! আসবার সময় রেবা দেবীর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন? জবাব দিলাম, না। ন্যাড়া কহিল, উচিত ছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খবর পেলে নিশ্চয়ই স্টেশনে আসতেন। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমি তো ওঁকে বেশি জানি না। যারা ওঁর সঙ্গে কাজ করেছে, সকলেই ওঁর কত প্রশংসা করে। বলে, বাংলা দেশে কত মেয়েই তো কাজে নেমেছেন, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না—কি রূপে, কি গুণে, কি দেশের ওপর ভালবাসায়! আমরা যেদিন এলাম, সেদিন নিজে স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিচ্ছু বললেন না, একদৃষ্টে আমাদের দেখতে লাগলেন। আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে হাতকড়ি, চারিদিকে পুলিস। মনে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কোথায় রইল ভয়! মনে হ'ল, ওই মুখের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীতে এমন কাজ নেই, যা আমরা করতে পারি না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, জেলে যখনই কষ্ট অসহ্য হয়েছে, তখনই চোখ বুজে ওঁর মুখ মনে করবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি, আমার শুধু একার কষ্ট, কিন্তু আমাদের যে যেখানে আছে, সকলের কষ্ট উনি নিজের বুকে তুলে নিয়েছেন। আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, যখনই মনে মনে ভারতমাতার মূর্তি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করি, তখনই রেবা দেবীর মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

ন্যাড়ার একজন সঙ্গী কহিল, দয়ালবাবুরা যখন জেল থেকে ফিরেছিলেন, তখন নাকি খুব প্রোসেশান হয়েছিল? আমরাও তো অনেকগুলি ফিরছি, আমাদের জন্যে কিছু হবে না?

ন্যাড়া কহিল, কি জানি! হবে হয়তো।

গাড়ি হইতে নামিয়া ন্যাড়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল এবং দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইল। যে ছেলেটি প্রোসেশনের জন্য বাহানা করিতেছিল, সে গজগজ করিতে লাগিল, একজনও কেউ আসে নি! এতদিন পরে ফিরে এলাম। আমরা তো আর লীডার না, ওদের জন্যেই সব।

সদলবলে কংগ্রেস-আফিসে হাজির হইলাম। দেখিলাম, কালান্তক-বাবু বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন ও চানাচুর খাইতেছেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আবার কে? আমাদের একজন কহিল, আমরা আজ জেল থেকে ফিরলাম। এক দোনা চানাচুর মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ভরাট মুখে কালান্তক কহিলেন, ও, তা এখানে কেন? সেই ছেলেটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, কোথায় যাব, শুনি?

কেন, বাড়িতে।

বাড়ির সঙ্গে তো সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছি, আবার ফিরব কোন্ মুখে?

তবে চুলোয় যাও।

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি গিয়ে কি করব আমরা?

কালান্তক জবাব দিলেন, লেখাপড়া অথবা গোচারণ—যা ইচ্ছে। হঠাৎ ন্যাড়ার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওই হাড়গিলে ছোকরা ও রকম ব'সে ব'সে ধুঁকছে কেন?

বলিলাম, ওর অসুখ হয়েছে, জেল থেকেই—

চানাচুর চর্বণ বন্ধ রাখিয়া কালান্তক প্রশ্ন করিলেন, কি অসুখ? বিবৃত করিলাম। কালান্তক কহিলেন, তা, এতক্ষণ ব'সে না ধুঁকে আমাকে বলতে কি হয়েছিল, শুনি? সারা শহরটাকে সারিয়ে দিলাম, আর ওর সামান্য সর্দিজ্বর— বলিয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধের বাক্স খুলিয়া একটি ছোট শিশি বাহির করিয়া ন্যাড়াকে কহিলেন, এদিকে স'রে এস

না হে ছোকরা। আমাকে যেতে হবে নাকি? ন্যাড়া সরিয়া বসিল। কালান্তক আদেশ দিলেন, হাঁ কর। ন্যাড়া হাঁ করিল। কালান্তকবাবু অতি সতর্কতার সহিত এক ফোঁটা ঔষধ ন্যাড়ার মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এতেই ভাল হয়ে যাবে, বাড়ি চ'লে যাও।

আমার দিকে তাকাইয়া কালান্তকবাবু কহিলেন, আপনিও জেল-ফেরত নাকি?

কহিলাম, আজ্ঞে না, আমি একে আনতে গিয়েছিলাম।

ওঃ।—বলিয়া কালান্তক দুই ঠোঁট চাপিয়া গাল ফুলাইলেন।

হাসিয়া কহিলাম, আপনি এখনও পা বাড়িয়ে আছেন দেখছি। জেলে যাওয়া আর ঘ'টে ওঠে নি, না?

মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া অনুযোগের স্বরে কালান্তকবাবু কহিলেন, সবাই ওই কথা বলছে! কিন্তু যাই কখন মশায়? সকলকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে করতেই আন্দোলন ফুরিয়ে গেল। তা ছাড়া, পা বাড়িয়ে থাকাটাই কি সোজা? কজন আছে শুনি?—বলিয়া জিজ্ঞাসু মুখে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কহিলাম, আন্দোলন তো বন্ধ হয়ে গেছে বলছেন; তবে নিজে এখানে এখনও প'ড়ে আছেন কেন?

কালান্তক কহিলেন, আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন চলছে হরিজন আন্দোলন। তাইই করছি। ঘরের কোণে কতকগুলা ছেঁড়া বই, ও ভাঙা স্লেট জড়ো করা ছিল, সেইগুলার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ওই দেখুন। মেথরদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি, চিকিচ্ছে করছি। ওদের দেহ ও মনের সম্পূর্ণ ভার এখন আমার হাতে। ঘরের আর এক কোণে একটা মাটির কলসী দেখাইয়া কহিলেন, ওটায় কি আছে জানেন? সর্বতীর্থের জল—যেখানে যত রকমের

হরিজন আছে, সকলের ছোঁয়া জল—খাবেন এক গ্লাস? খাও না হে এক এক গ্ল্যাস ক'রে সব।

কথাটা উলটাইয়া দিয়া কহিলাম, দেখুন, এখানে দিন কতক থাকতে চাই।

কালান্তকবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, এখানে থাকা চলবে না।

কহিলাম, বেশ। এ শহরে?

তা থাকতে পারেন। কিন্তু কেন?

এর চিকিচ্ছে করাবার জন্যে।

বিস্মিতকণ্ঠে কালান্তক কহিলেন, আবার চিকিচ্ছে কেন? চিকিচ্ছে তো হ'ল।

কহিলাম, তা তো হ'লই, তবু আরও দু-একজনকে দেখাতে চাই।

মুখ গম্ভীর করিয়া কালান্তক কহিলেন, দেখানগে, তা আমার সঙ্গে পরামর্শ কেন?

মানে, আপনার সঙ্গে ডাক্তারদের আলাপ আছে, যদি একটু ব'লে দেন—

পাগল হয়েছেন নাকি? তা আবার কোন ডাক্তার পারে? ওসব আমার দ্বারা হবে না মশায়।

কংগ্রেস-আফিস হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, একটা রিক্‌শ হইতে নকুড়বাবু ও রেবা দেবী নামিতেছেন। সকলে তাঁহাদের অভিবাদন করিল। ন্যাড়া রেবা দেবীর কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কহিল, চিনতে পারেন? রেবা দেবী জীবনে ন্যাড়াকে কখনও দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ ও চোখ দেখিয়া মনে হইল না। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, চিনতে পারছি না তো! ন্যাড়া আত্মপরিচয়

বিবৃত করিল। রেবা দেবী ধাপ্পা দিয়া কহিলেন, চিনতে পেরেছি, জেল থেকে ফিরছেন বুঝি?

হ্যাড়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা সবাই।

স্বীয় বদনমণ্ডলে যুগপৎ ঈষৎ হাস্য ও দন্ত বিকাশ করিয়া রেবা দেবী কহিলেন, ও, সবাই! আচ্ছা, এবার বাড়ি যান, অনেকদিন আত্মীয়-স্বজনদের দেখেন নি।

আমি কহিলাম, খুব অসুখ হয়েছিল।

আমার দিকে চাহিয়া রেবা দেবী কহিলেন, কার? আপনার নাকি? বেশ ভাল আছেন তো?

কহিলাম, আমার নয়, এর।—বলিয়া হ্যাড়াকে দেখাইলাম। রেবা দেবী দুই চক্ষে করুণা ও সমবেদনা ফুটাইয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, আপনার? তাই এমন কাহিল হয়ে গেছেন। খুব কষ্ট হয়েছিল বুঝি? আহা! হ্যাড়ার দুই চোখ চকচক করিতে লাগিল। একজন ছেলে নকুড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কি করব এবার? নকুড়বাবু কহিলেন, এখন সব বাড়ি যাও। গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কর। দুঃখী দরিদ্র ও অধঃপতিতদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, দেশের গণশক্তিকে জাগিয়ে তোল। আগামী আন্দোলনের ক্ষেত্র আর নগরে নয়, গ্রামে। লক্ষ লক্ষ পল্লী নিয়েই তো ভারতবর্ষ। তেত্রিশ কোটি লোকের—

বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিলাম, এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

নকুড়বাবু কহিলেন, তা করুন। বৃষবাহনবাবু এখানকার ভাল ডাক্তার। তাঁকে দেখান। আচ্ছা, নমস্কার।—বলিয়া সকন্যা কংগ্রেস-আফিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ছেলেরাই চেষ্টা করিয়া একটা বাড়ি খুঁজিয়া দিল। বড় রাস্তা হইতে কিছু দূরে, একটি ছোট গলির মধ্যে। গলিটার গতি এই বাড়ি

পর্যন্তই। ছোট একতলা বাড়ি, চারিদিকে ঘন বসতি, কিন্তু কাহারও বাড়িতে যাতায়াতের পথ নাই। বাড়িওয়ালার বাড়ি কাছেই। জাতিতে মোদক, শহরে দোকানদারি করিয়া দুই পয়সা উপার্জন করে। কংগ্রেসের নাম শুনিয়া বেশি ভাড়া চাহিল ও তখনই চাহিল। কারণ সে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল, কংগ্রেসের লোকদের উপর তাহার আস্থা নাই। আরও কোথাও খুঁজিবার ভয়ে তাহার প্রস্তাবে রাজি হইলাম এবং ছেলেদের হেপাজতে ন্যাড়াকে রাখিয়া বাড়ি গিয়া তাহার মা ও দিদিকে লইয়া আসিলাম।

তিন দিন পরে সকাল আটটার সময়ে বৃষবাহনবাবুর বাড়িতে হাজির হইলাম। দোতলা বাড়ি, প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে দেওয়ালে কাষ্ঠ-ফলকে ডাক্তারের নাম ও খেতাব লেখা ছিল। ডিস্পেন্সারির বারান্দায় অনেক রোগীর ভিড়। ভিতরে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতেছিলেন। প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। ডাক্তারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; দেখিতে লম্বা ও রোগা; মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। পরিধানে দেশী দরজির তৈয়ারি গরদের স্যুট, টাই-হীন গলদেশ হইতে স্টেথোস্কোপ লম্বমান। চেয়ারে ঠেস দিয়া ডাক্তারবাবু একজন রোগীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। কথা বলিবার সময়ে, কাঠে র‍্যাদা চালাইবার সময় যেমন খ্যাসখ্যাস শব্দ হয়, সেই ধরনের শব্দ হইতেছিল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, যা ডায়াগ্‌নোসিস করেছি, বিধান রায়ের সাধ্য নেই ওতে হাত দেয়, গিয়ে দেখতে পার।

রোগী যুক্তহস্তে কহিল, বিধান-টিধান আমরা জানি না বাবু। আপনার মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে আছি।

তা তো আছ মুখেই শুনছি, ফীর বহর দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। দু টাকায় চলবে না বাপু, চার টাকা দিতে হবে।

রোগী কহিল, বাবু, পুরোতন রুগী আমি।

ডাক্তার কহিলেন, রুগী তো পুরোতন, রোগ তো পুরোতন নয়। রীতিমত নতুন আর সাংঘাতিক। ভাল ক'রে তেড়ে ফুঁড়ে চিকিচ্ছে না করলে এ যাত্রায় বেঁচে ওঠা—

রোগী ভয় পাইয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বাবু, বাঁচব না নাকি?

ডাক্তার অভয় দিয়া কহিলেন, বাঁচবে না, তাই কি আমি বলছি! বাঁচবে, তবে খুব চেষ্টা করতে হবে, আর আমাকেই করতে হবে। সস্তা খুঁজতে গিয়ে যদি আর কোথাও যাও, তো শেষ রাস্তা দেখতে হবে।

রোগী বলিল, রাম বল! আর কোথায় যাব বাবু? ডাক্তার কি আর কেউ আছে শহরে? সবগুলিই তো সাক্ষাৎ যমদূত।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, মিছে কথা নয়। চিকিচ্ছের 'চ' জানে না কেউ।—বলিয়া সহাস্য মুখে সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইলেন। রোগী আরও দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিল। ডাক্তার তাহা ড্রয়ারস্থ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন চার টাকাতেই হচ্ছে, বিলেত থেকে ফিরে এলে ষোল টাকাতেও থই পাবে না।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কখন যাচ্ছেন?

ডাক্তার দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, বাম চোখটি ছোট করিয়া কহিলেন, সবই তো ঠিক, পাস্‌পোর্ট পেলেই চ'লে যাচ্ছি।

একে একে সব রোগী বিদায় হইলে আগাইয়া সামনে বসিতেই ডাক্তার কহিলেন, আপনার কি?

ন্যাড়ার নিজের ও রোগের পরিচয় জ্ঞাপন করিলাম। ডাক্তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জেলে গিছল? কংগ্রেসের লোক? একটু

চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, যাবার আপত্তি নেই। পুরো ফী দিতে হবে কিন্তু। অনুনয় সহকারে কহিলাম, অত্যন্ত দরিদ্র। ডাক্তার নীরস-কণ্ঠে জবাব দিলেন, তা হ'লে হাসপাতালে নিয়ে যান, একটি পয়সাও খরচ হবে না।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই, বেরুতে হবে। কহিলাম, কিছু অনুগ্রহ করতে হবে ডাক্তার-বাবু! ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, কিচ্ছু অনুগ্রহ করতে পারব না, মাপ করুন। কংগ্রেসের কাজ ক'রে আর জেলে গিয়ে এমন কিছু আমার মাথা কিনে রাখেন নি যে, বিনা পয়সায় ছুটতে হবে। কোনও দোকানদার কি কংগ্রেসের নাম শুনে আধা দামে জিনিস ছেড়ে দেয়? তবে আমার ওপরই নেকনজরটা কেন? পুরো ফী দিতে পারবেন তো বলুন, এখনই যাচ্ছি, না হ'লে অন্যত্র দেখুন।—বলিয়া হাত বাড়াইলেন।

অগ্রিম পুরা ফী দিয়াই বৃষবাহনবাবুকে লইয়া আসিলাম। রোগী দেখিয়া ডাক্তার গম্ভীর মুখে কহিলেন, নিমোনিয়া হবার উপক্রম হয়েছে, খুব সাবধান হওয়া দরকার। বিদায় লইবার সময় ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যা ক'রে দিলাম, তাইই চালান। বোধ হয় ডাকতে পারবেন না আমাকে। তবে এ পাড়ায় বিজয় ডাক্তার আছে, কম ফী, তাকেই ডেকে দেখাবেন। দরকার হ'লে আমাকে খবর দিতে পারেন।

সেই দিন রাত্রে ন্যাড়ার জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। পরদিন সকালে বিজয় ডাক্তারের দ্বারস্থ হইলাম। বিজয়বাবুর বয়স প্রায় ত্রিশ, মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করা। গোলগাল চেহারা, হাস্যময় মুখ। অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত আমার বক্তব্য শুনিলেন এবং আমার সঙ্গেই আসিলেন। রোগী দেখিয়া কিন্তু তাঁহার মুখ কালো হইয়া উঠিল। কহিলেন, নিমোনিয়া, দুটো লাংসই অ্যাফেক্ট করেছে। বৃষবাহনবাবুর

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দেখিয়া কহিলেন, এইটাই চলুক, দরকার হ'লে বদলে দেবেন। ফী দিতে গেলে হাসিয়া কহিলেন, আমাকে এখন ফী দিতে হবে না, রুগীর ব্যবস্থা করুন আগে। সেরে উঠুক, তারপর যা হয় দেবেন।

বিজয়বাবু অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মধ্যে আর একদিন বৃষবাহনবাবুকেও ডাকা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগীর অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ন্যাড়া ভুল বকিতে লাগিল। নানা রকমের কথা, জেলখানার নানা অভিজ্ঞতার টুকরা টুকরা স্মৃতি। একদিন দুই রক্তবর্ণ চোখ আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, রেবা দেবী এসেছিলেন, না? কহিলাম, কই, না তো! আমার কথা কানে না তুলিয়া কহিল, এসেছিলেন, আমি দেখেছি।—বলিয়া দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

ন্যাড়ার মা সেই যে প্রথম দিন হইতে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, দিনান্তে একবার নাওয়া-খাওয়ার জন্য ছাড়া আর মুহূর্তের জন্যও কোথাও নড়িতেন না। কখনও রোগীকে খাওয়াইতেন, মাথায় হাত বুলাইতেন, পাখা করিতেন এবং অধিকাংশ সময় একদৃষ্টে ন্যাড়ার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ন্যাড়া যেন দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছিল; চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। কাহাকেও চিনিতে পারিত না, ডাকিলে সাড়া দিত না, শুধু মাঝে মাঝে দুই রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া কাহাকে যেন খুঁজিত। একদিন রাত্রে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। বিজয়বাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, ক্রাইসিস, আজ রাত্রি কাটে তো ভাল হয়ে যাবে। সমস্ত রাত্রি যমে ও মানুষে টানাটানি হইল। সকালবেলা রোগীর অবস্থা ভালর দিকে ফিরিল। জ্বর কমিয়া আসিল, আচ্ছন্ন ভাবটা

অনেকটা পরিষ্কার হইল ও চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বিজয়বাবু নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, যাক, ফাঁড়া কেটে গেল, আমি একবার আসি।
—বলিয়া বিদায় লইলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম।

বেলা দশটার সময় বিজয়বাবু আসিয়া রোগী দেখিয়া আমাকে ইঙ্গিতে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, অবস্থা তো ভাল দেখছি না।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, সে কি!

হ্যাঁ, কোলাপ্স্ ক'রে আসছে, আপনি—আপনি একবার বৃষবাহনবাবুকে ডাকুন।

বৃষবাহনবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। বৃষবাবু রোগী দেখিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, হোপ্‌লেস! কোনও আশা নেই, তবে—। বলিয়া বিজয়বাবুকে কতকগুলা ঔষধ ইন্‌জেক্‌শন করিতে পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন:

ন্যাড়া হাঁপাইতেছিল। আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া কহিল, দিদিকে দেখব। লক্ষ্মী মাথার কাছে মলিন বিষণ্ণ মুখে বসিয়া ছিল। ন্যাড়ার মুখের কাছে নিজের মুখ আনিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, এই যে ভাই আমি! মাথা নাড়িয়া ন্যাড়া কহিল, তুমি না, রেবাদিদিকে। লক্ষ্মী মলিন মুখ মলিনতর করিয়া সরিয়া বসিল।

রেবা দেবীকে লইয়া আসিবার জন্য নকুড়বাবুর বাড়িতে হাজির হইলাম। বাড়ি দেখিয়া মনে হইল, নকুড়বাবু সম্পন্ন গৃহস্থ। উঁহার বাবা নাকি সরকারী চাকরি করিয়া অনেক টাকা ও বিষয়-আশয় রাখিয়া গিয়াছেন। দোতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে কাঁটা তার দিয়া ঘেরা দেশী ও বিলাতী ফুলের বাগান। বাগানের সামনে কাঠের তৈয়ারি গেট; একটি পত্র-পুষ্প-বহুল বৃহৎ লতা অর্ধচক্রাকারে ঘিরিয়া গেটের মাথাটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ির মধ্যে যাইতে

হইল। নকুড়বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আজ আর পরিধানে কটিবস্ত্র ছিল না, পুরা মাপের মিহি ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে স্যাণ্ডেল। নমস্কার করিতেই আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কে আপনি? পরিচয় দিতেই কহিলেন, বসুন, কি দরকার আপনার? ন্যাড়ার সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া কহিলাম, বাঁচবার আশা নেই, একবার রেবা দেবীকে দেখতে চায়।

বিস্মিতকণ্ঠে নকুড়বাবু কহিলেন, রেবাকে দেখতে চায়? কেন?

কহিলাম, ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে, একবারটি পাঠিয়ে দিতে হবে আপনাকে।

অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া নকুড়বাবু কহিলেন, পাগল হয়েছেন আপনি? কোথায় যাবে সেখানে!

এমন সময়ে রেবা দেবী 'বাবা!' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে দেখিয়াই একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর গম্ভীরভাবে নকুড়বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবা দেবী সদ্যস্নাতা, পিঠ ছাইয়া খোলা ভিজা চুলের রাশি; কপালে সিন্দুরের টিপ, পরিধানে কালো চওড়া-পাড়ের ফরাসডাঙার শাড়ি ও সাদা শেমিজ, পা খালি। প্রবেশ করিতেই একটি মৃদু সুগন্ধ কক্ষের বাতাসকে আমোদিত করিল।

নকুড়বাবু বিরক্তমুখে কহিলেন, এই ভদ্রলোক কি ফ্যাসাদ আমদানি করেছেন, দেখ! সেদিনের সেই ছোকরা—নারায়ণবাবু না কি নাম—মরতে বসেছে। হঠাৎ তোমাকে দেখবার তার শখ হয়েছে। যেতে পারবে?

রেবা দেবী কহিলেন, তা কি ক'রে হবে বাবা? আজ যে

এগারোটার গাড়িতে পিসীমা যাবেন। তুমি যে আমাদের নিয়ে স্টেশনে যাবে বলেছিলে।

নকুড়বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, তাই তো। কিচ্ছু মনে ছিল না। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আর তো সময় নেই। কাউকে একটা গাড়ি শিগগির ডেকে আনতে পাঠিয়ে দাওগে। রেবা দেবী যাইতে উদ্যত হইয়া, থামিয়া আমাকে কহিলেন, দেখুন, সত্যি আমি ভারি দুঃখিত। সময় থাকলে নিশ্চয় যেতাম।

নকুড়বাবু কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও। নিজের ছেলের মত সব। তা কিছু মনে করবেন না। আপনি নারায়ণবাবুর মাকে আমাদের সমবেদনা জানাবেন। পারি তো একটা শোকসভা ডেকে রিজল্যুশন ক'রে পাঠিয়ে দোব এখন। ঠিকানাটা কংগ্রেস-আফিসে রেখে যাবেন। আর দেখুন, যাবার সময় কালান্তকবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাবেন, শবযাত্রার ব্যবস্থা করবার জন্যে। খুব চৌকস লোক, বিন্দুমাত্র খুঁত থাকতে দেবেন না।

যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, ন্যাড়ার তখন শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, জ্ঞান নাই, দুই চক্ষু মুদ্রিত, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। ন্যাড়ার মা ও লক্ষ্মী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে। আমি কহিলাম, এখন কাঁদবেন না কাকীমা। সারাজীবন ধ'রে কাঁদবার সময় পাবেন। ওকে শান্তিতে যেতে দিন।

আমি যে আর পারছি না বাবা! বুক যে ফেটে যাচ্ছে আমার!
—বলিয়া ন্যাড়ার মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দরজা হইতে কে হাঁক দিল, শুনছেন মশাই! একবার বেরিয়ে আসুন না!

চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বাড়িওয়ালা উঠানে

আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, এত কান্নাকাটি কিসের? ব্যাপার কি বলুন দেখি?

আমি কহিলাম, ছেলেটি মারা যাচ্ছে।

আঁতকাইয়া উঠিয়া বাড়িওয়ালা কহিল, মারা যাচ্ছে! বলেন কি মশায়?

কহিলাম, আজ্ঞে হাঁ। কি করব বলুন? আমাদের অদেষ্ট।

নীরসকণ্ঠে বাড়িওয়ালা কহিল, আপনাদের অদেষ্ট তো বুঝলাম, কিন্তু বাড়ির মধ্যে মরা তো চলবে না মশায়! এর পর ভাড়াটে পাওয়া দুঃসাধ্যি হবে। সরাতে হবে এখনি।

আশ্চর্য হইলাম। কহিলাম, বলেন কি? ঠোঁটের কাছে প্রাণটুকু লেগে আছে, এখনি বেরিয়ে যাবে যে!

কড়া গলায় লোকটা কহিল, তা যাক, কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে যাওয়া চলবে না।

কহিলাম, আপনি মানুষ, না পিশাচ? একটু মনুষ্যত্ব নেই আপনার?

না নেই, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজেরা সরাবে, না, লোক ডাকব?—বলিয়া লোকটা বোধ করি লোকজন ডাকিয়া আনিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর ন্যাড়ার ঘরের দিকে যাইতেই ন্যাড়ার মা বাহিরে আসিয়া সজলচক্ষে কহিলেন, কাজ নেই বাবা, ঝগড়া ক'রে। শহর জায়গা, আপনার বলতে কেউ নেই।

ধরাধরি করিয়া ন্যাড়াকে বাহিরে আনিয়া রোয়াকে শোয়াইলাম। মিনিট কয়েক পরেই মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ন্যাড়া চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে কালান্তকবাবু ও তাঁহার অনুচরবর্গ আসিয়া হাজির হইলেন। বিজয়বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ আসিলেন। শহরের অনেকে আসিল। একটা খাটিয়ায় তোশক ও তাহার উপর ফরসা চাদর পাতা হইল। ন্যাড়ার মার বুক হইতে ন্যাড়াকে কাড়িয়া লইয়া সেখানে শোয়ানো হইল, এবং একটা স্বরাজ পতাকা দিয়া তাহার আপাদমস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কে একরাশি ফুল লইয়া আসিয়া সমস্ত বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। কংগ্রেস-সেবকরা খাটিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল। পিছনে কীর্তনের দল খোল ও করতাল বাজাইয়া জীবনের অনিত্যতা ও সংসারের অকিঞ্চিৎকরতা বিনাইয়া বিনাইয়া সুরে ও বেসুরে প্রচার করিতে করিতে চলিল; এবং তাহাদের পশ্চাতে শত শত হুজুকপ্রিয় লোক, এমন কি বাড়িওয়ালাটা পর্যন্ত, দেশমাতা ও তাঁহার গতায়ু সেবকের জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ন্যাড়ার মা অশ্রু-সজল বিস্ময়-বিহ্বল নয়ন মেলিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্রের জয়ধ্বনি-মুখর শেষ-যাত্রাপথের পানে তাকাইয়া রহিলেন। এবং ন্যাড়ার দেহমুক্ত আত্মা বোধ হয় সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে বুঝিতে পারিল যে, এই শোকোচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধাঞ্জলি বাতিকগ্রস্ত জনতার সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র, ইহা কাহারও উদ্দেশ্যে নহে, কাহারও প্রাপ্য নহে—না দেশমাতার, না তাহার।

তার পরদিন সকলকে লইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু ন্যাড়াকে ভুলিতে পারি নাই। যখনই শুনি, কোন লোক শুধু দেশসেবা দ্বারা বড়লোক হইয়াছে, কলিকাতায় কর্পোরেশনে মোটা মাহিনার চাকুরি পাইয়াছে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি রূপ কল্পবৃক্ষের মগডালে চড়িয়া কাঁচা ডাঁশা ও পাকা ফল নির্বিচারে সাবাড় করিতেছে এবং কাউন্সিলে ঢুকিয়া শুধু হাত তুলিয়া মুঠা মুঠা টাকা ঘরে আনিতেছে,

তখনই ন্যাড়ার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ন্যাড়া বাঁচিয়া থাকিলে এমনই হইতে পারিত।

ন্যাড়ার মা এখনও কাঁদিতেছেন, আমায় নিয়ে যা বাবা! আর যে একলা থাকতে পারি না ধন!

চন্দ্র ডাক্তার

এতগুলা গ্রামের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার—চন্দ্র ডাক্তার। এ তরফে এতবড় ডাক্তার আর নাই—পাস-করা ডাক্তার। কি পাস-করা, কোথায় পাস-করা জানিবার প্রয়োজন নাই; এই কথা জানিয়া রাখিলেই চলিবে, চন্দ্র ডাক্তার বড় ডাক্তার, যাঁহার কাছে নগাঁয়ের তারিণী কবিরাজ এবং শনবুনীর বুড়া হরিশ নাপিতও কলিকা পায় না।

ধুতির উপর গলাবন্ধ কোট পরিয়া, মাথায় হ্যাট চড়াইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া চন্দ্র ডাক্তার ডাক্তারি করিয়া বেড়ান। ঘোড়া খুব শিক্ষিত ঘোড়া, মাঠের এক হাত চওড়া আলের উপরে এদিক ওদিক না পড়িয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতে পারে। ঘোড়া রাখিতে ডাক্তারের এক পয়সা খরচ হয় না। বাড়ি ফিরিয়া ডাক্তার ঘোড়া ছাড়িয়া দেন; সমস্ত রাত্রি পুকুরের দল ও মাঠের ঘাস খাইয়া ঘোড়াটা ঠিক সকালে ঘরে ফিরে—আশ্চর্য ঘোড়া, শিক্ষিত ঘোড়া।

চন্দ্র ডাক্তার অত্যন্ত বদমেজাজী লোক। রোগীরা সব সময়ে ভয়ে সন্ত্রস্ত, ধমক তো লাগিয়াই আছে, ঘোড়ার চাবুকটাও মাঝে মাঝে তাহাদের পিঠ ছুঁইয়া যায়। তাহাতে তাহারা কিছু মনে করে না। যে গাভী দুগ্ধ দেয়, তাহার চাট সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস আছে। চন্দ্র ডাক্তারের বৈঠকখানায় তাঁহার ডিস্‌পেন্সারি; দুইটা কাচের আলমারি, তাহার ভিতরে রকমারি ঔষধ—লাল, নীল, কত রঙের। ঔষধসুদ্ধ আলমারি দুইটার দাম গ্রামের লোক এখনও হিসাব করিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর কতকগুলা শিশি, একটা ওজন করিবার নিক্তি ও মেজার-গ্লাস সাজানো।

তাহারই সামনে একটা টুলে বসিয়া বড়জুড়ির পঞ্চানন পাল কম্পাউণ্ডারি করে। অবশ্য ডাক্তার থাকিলে তাঁহার সামনে টুলে বসিবার সাধ্য পঞ্চাননের পিতামহেরও নাই, তখন দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়। ঘরের অন্য দিকে একটা টেবিল ও চেয়ার লইয়া চন্দ্র ডাক্তার বসেন। রোগীরা খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে; যাহারা অক্ষম, তাহাদের উবু হইয়া বসিবার হুকুম আছে।

চন্দ্র ডাক্তার বিপত্নীক। আট বছর পূর্বে তাঁহার পত্নী নারায়ণী ইহলোক ত্যাগ করেন। এই কার্য করিয়া নারায়ণী ভাল করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে গ্রামের মহিলা-সমাজে সকলের মত এক নহে। এক দল বলে, নারায়ণীর হাড় জুড়াইয়াছে, এই কাঠখোট্টা দুর্মুখ স্বামী লইয়া সংসার করার চেয়ে চিতায় শোয়া ঢের ভাল। অন্য দল বলে, রাজার মত স্বামী, রাজকন্যার মত মেয়ে ছাড়িয়া সোনার সংসার ভরাডুবি করিয়া যাওয়া কি সোজা মা? নারায়ণী হতভাগিনী।

রাজকন্যার মত মেয়ের নাম কল্যাণী। দশ বছরের মেয়ে, ফুটফুটে রঙ, ছিপছিপে গড়ন, একমাথা ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, কখনও কোন দিন চিরুনি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি, গাছকোমর বাঁধা; কচি মুখ দুষ্টামিতে ভরা; দুর্দান্ত মেয়ে, কখনও ধীরে চলিতে জানে না, ছুটিয়াই চলে। গাঁয়ের তাহার সমবয়সী মেয়েদের সে তোয়াক্কা করে না, ছেলেরাই তাহার বন্ধু। তাহারাও তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠে না; গাছের মগডালে উঠিয়া পাখির ছানা সংগ্রহ করায়, নদীতে সাঁতার দেওয়ায়, শৈলী মাসীর বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া ভরি দুপুরে রোদে-শুকাইতে-দেওয়া আচারের হাঁড়ি হইতে আচার চুরি করায় সেই তাহাদের অগ্রণী। মার্বেল ও গুলিডাণ্ডা খেলায় কেহ তাহার সমকক্ষ নয়; লুকাচুরি খেলায় কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির

করিতে পারে না। গ্রামের পিতা-মাতাদের তরফ হইতে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ প্রতিনিয়ত জমিয়া উঠে; কিন্তু ডাক্তারের কাছে কিছুই পৌঁছে না। যা দুর্দান্ত মানুষ, হয়তো মেয়েটাকে মারিয়া ফেলিবে! আহা, মা-হারা মেয়ে; সকলে স্নেহও করে। কখনও কোন প্রবীণা হয়তো কল্যাণীকে অনেক কষ্টে বাগ মানাইয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে কল্যাণী, তোর বাবা তোকে ভালবাসে? কল্যাণী অপরিচ্ছন্ন ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা নাড়িয়া স্পষ্ট জবাব দেয়, না। প্রশ্ন হয়, তোর পিসীমা তোকে ভালবাসে না? কল্যাণী ততোধিক ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, না। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে, বুড়ী ডাইনী। আবার প্রশ্ন হয়, তোকে কেউ ভালবাসে না, হ্যাঁরে কল্যাণী? কল্যাণী বলে, কেন, বিশু ভালবাসে। পিসীমাটি চন্দ্র ডাক্তারের দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী, নারায়ণীর মৃত্যুর পর ডাক্তারের সংসার-তরীর হাল ধরিয়াছেন; বিশু পুরাতন চাকর।

সত্যই চন্দ্র ডাক্তার সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। সকালে বাহির হইয়া যান, রাত্রে কখন ফেরেন তাহার ঠিক নাই; সংসারের কি হইতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, এমন কি মাতৃহীন মেয়েকে কে দেখে, কে যত্ন-আত্তি করে, কিছুই লক্ষ্য রাখেন না। নিজের কাজ লইয়াই আছেন। নিজের শরীর ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য আছে নাকি? তাহাও নাই; আহারের ঠিক নাই, নিদ্রার ঠিক নাই, যেন একটা যন্ত্র—মায়ামমতাহীন; অনিবার্য বিরামহীন গতিতে চলিয়াছে তো চলিয়াছেই।

ভাদ্র মাসের শেষ। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেই নিঃশব্দচরণে অলক্ষ্যে কখন শরৎলক্ষ্মী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আকাশ মেঘহীন, স্নিগ্ধ

প্রভাতরৌদ্রে গাছের পাতাগুলি চিকচিক করিতেছে; দিগন্তপ্রসারী মাঠ সবুজ শস্তে ভরিয়া গিয়াছে; পুকুরের থইথই-করা জলে অজস্র শালুক ও পদ্ম ফুটিয়াছে। গ্রামের পথঘাট জলে কাদায় ভর্তি; মাটির ঘরগুলি বর্ষার দাপটে বিপর্যস্ত। অসংখ্য ঝোপঝাপে মশকের দল বাসা বাঁধিয়াছে। সবিক্রমে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, ঘরে ঘরে রোগীর আর্তনাদ। চন্দ্র ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারিতে সকাল হইতে রোগীর ভিড় দুপুর-রাত্রি পর্যন্ত। ডাক্তারের সময় নাই, তাঁহার শিক্ষিত ঘোড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়াছে তো চলিয়াছেই।

একদা প্রভাত। গ্রামের বুড়াশিবের মন্দিরের আটচালাতে পাঠশালা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ছেলের দল কলরব করিয়া পড়িতেছে, বুড়া পণ্ডিত মহাশয় একটা চাটাইয়ের উপর বসিয়া সুতাবাঁধা নিকেলের চশমা চোখে দিয়া প্রায় উপুড় হইয়া একটা পুরানো খবরের কাগজ পড়িতেছেন। হঠাৎ একটা হুঙ্কার করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সোজা হইয়া বসিলেন এবং চশমাওয়ালা মুখটাকে কোন এক বিশেষ দিকে ফিরাইয়া হাঁক দিলেন, এই ন্যাড়া, ওখানে গোল হচ্ছে কেন রে? সব নিস্তব্ধ, টুঁ করিলে শুনা যায়। ন্যাড়া প্যানপেনে গলায় চীৎকার করিয়া কহিল, আমি নয় পণ্ডিত মশাই, সদা গল্প করছে কলির সঙ্গে। অর্থাৎ কল্যাণী। গুরু মহাশয় গলা বাড়াইয়া ডাক ছাড়িলেন, এই কল্যাণী, তুই এতদিন আসিস নি কেন? কল্যাণী কহিল, বাবা পড়তে বারণ করেছে পণ্ডিত মশাই। পণ্ডিত কহিলেন, বারণ করেছে তো এসেছিস কেন? যা এখান থেকে। নিজে পড়বে না তো কাউকে পড়তে দেবে না। ছেলেদের দিকে তাকাইয়া একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন, গুবরেপোকা বাতি নষ্ট করে, তোরা দেখেছিস? তেমনই আর কি! হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয় মাথায় হাত

দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সদানন্দের শ্লেটখানা সশব্দে তাঁহার মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরের দৃশ্য কে বর্ণনা করিবে? ছেলেদের কলরবের সহিত পণ্ডিতের চীৎকার মিশিয়া যেন হাট বসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ঝোপঝাপ বনবাদাড় ভাঙিয়া কল্যাণী ছুটিয়াছে, এবং তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছনে প্রাণপণে ছুটিতেছে কতকগুলি ছেলে।

২

সেদিন চন্দ্র ডাক্তারের ডাক্তারখানায় ভিড়ের অন্ত নাই। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে রোগী ও রোগীর আত্মীয়ের দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডাক্তারখানার ভিতরে রোগী দেখা চলিতেছে। এখানের কাজ সারিয়া ডাক্তারকে এখনই বাহির হইতে হইবে। তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাদিন, বোধ করি রাত্রি পর্যন্ত, রোগী দেখিতে হইবে।

চন্দ্র ডাক্তারের মেজাজ সেদিন ভাল নয়, মাঝে মাঝে গর্জন হইতেছে। একজন রোগী 'কি খাইব' জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আর যাহাই হউক, রোগীর পথ্য নহে; দূর গ্রাম হইতে আগত এক ব্যক্তি লাঠি ও লণ্ঠন হাতে করিয়াই ডাক্তারখানার ভিতরে ঢুকিয়াছিল বলিয়া এমন তাড়া খাইয়াছে যে, সে লণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছে; পঞ্চানন দুইবার মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে; এক ব্যক্তি ঔষধের দাম কম দেওয়ায় ডাক্তার তাহার

টাকা-পয়সা ডাক্তারখানার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সে বেচারী তাহার না-খুঁজিয়া-পাওয়া সিকিটা এখনও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

এমন সময়ে কলরব করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় ও কতকগুলা ছেলে আসিয়া হাজির হইল। পণ্ডিতের মাথার ডান পাশটা একটুখানি কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। ছেলেরা, কেহ হাতে, কেহ পায়ে আহত হইয়াছে বলিয়া জানাইল। পণ্ডিত গ্রামের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সকলেই তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিয়া ফিসফিস করিয়া সহানুভূতি ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি কহিল, ডাক্তারবাবুর কাছে যান আপনি। ইঙ্গিতে কহিল, ঘরের মধ্যেই আছেন।

ডাক্তার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্টেথোস্কোপ দিয়া একজন রোগীর বুক পরীক্ষা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ধমক চলিতেছিল, খাড়া হয়ে দাঁড়াও, জোরে নিশ্বাস ফেল, এপাশ ফের, ইত্যাদি। পণ্ডিত মহাশয় একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। পঞ্চানন তাঁহাকে ঢুকিতে নিষেধ করিতে গিয়া তাঁহার রক্তাক্ত মস্তক দেখিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া ডাক্তার তাহাকে ধমকাইতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন ও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার এ কি? পণ্ডিত মহাশয় মাথায় হাত দিয়া উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বয়সে মারামারি করতে গিয়েছিলেন নাকি? পণ্ডিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না। প্রশ্ন হইল, যান নি তো মারলে কে? পণ্ডিত কহিলেন, মেরেছে আপনার মেয়ে—কল্যাণী। ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাঁহার মেয়ে? কল্যাণী? এই বুড়া পণ্ডিতকে এমন করিয়া মারিবার মত তাহার বয়স হইয়াছে নাকি? প্রশ্ন করিল, আমার মেয়ে তো নেহাত বাচ্চা, সে আপনাকে

মারবে, তা কি সম্ভব?—বলিয়া একবার পঞ্চাননের দিকে ও তারপর দুয়ারে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান রোগীগণের দিকে তাকাইলেন। তাহারা একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহারাও একবিন্দু বিশ্বাস করে না। পণ্ডিতের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মেয়ে মারিয়াছে, তাহার বাবা কোথায় একটু সান্ত্বনা দিবে, না, মিথ্যা নালিশ করিতে আসিয়াছে বলিয়া শাসাইতেছে! যেমন মেয়ে, তাহার তেমনই বাপ!

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সম্ভব। আপনার মেয়ে বাচ্চা হ'লে কি হবে মশায়, তার স্বভাবটি তো বাচ্চার মত নয়। দুর্দান্ত বদমাইশ। শুধু আমাকেই মেরেছে নাকি? —বলিয়া দরজার দিকে তাকাইতেই ন্যাড়া ও নন্দ দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পণ্ডিতের দুই পাশে দাঁড়াইল। তাহাদের একজনের হাতে দাঁতের দাগ, তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত জমিয়াছে; অন্যজনের পা কাটিয়া গিয়াছে। পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, পাঠশালার ছেলেগুলোকে মেরে একশা ক'রে দিয়েছে, এতবড় বদমাইশ মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি মশায়। সবাইকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে; আপনার খাতিরে কেউ কিছু বলে না, নইলে—। গ্রামের লোকগুলাকে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, এরা সবাই জানে। কিন্তু আর তো পারা যায় না মশায়। হয় এর প্রতিকার করুন, নয়, বলেন তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গাঁ থেকে উঠে যাই। এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া পণ্ডিত হাঁপাইতে লাগিলেন। দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, আমার অপরাধ কি? না, সকালে আজ এক মাস পরে পাঠশালা গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কল্যাণী, এতদিন আস নি কেন মা? এই কথাটি শুধু ভাল ক'রে বলেছি তো কি তেজ মেয়ের, বলে, 'বাবা আমাকে তোমার কাছে পড়তে মানা করেছে, বলেছে—বুড়ো কিছু জানে না।'

বললাম, ছিঃ মা, মিথ্যে বলতে নেই। তো মশায় একখানা স্লেট নিয়ে দড়াম ক'রে মাথায় বসিয়ে দিলে, গলগল ক'রে রক্ত বেরুতে লাগল, কি করি ভাবছি—তখন দেখি সোঁ-সোঁ ক'রে ঢিল পড়ছে এর মাথায় তার মাথায়। উঃ, কি দজ্জাল মেয়ে মশায়! ও মেয়ে আপনার ডাকাত হবে, যদি এখন থেকে শাসন না করেন।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল। এতগুলা রোগীর সামনে এমন অপমান! একবার মনে হইল, চাবকাইয়া এই বুড়া পণ্ডিতকে সোজা করিয়া দেন, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া রোগীগুলাকে ধমক দিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং চাবুকটা লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিলেন, কই, কোথায় সে? পণ্ডিত মহাশয় ডাক্তারের রাগ দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, তা কি ক'রে জানব? ধরতে পাঠিয়েছি।

কি ক'রে জানব? আনতে পারেন নি তো নালিশ করতে এসেছেন কেন? যান, ধ'রে আনুন।—বলিয়া যে ভাবে হাতের চাবুক চালাইলেন, পণ্ডিতের মনে হইল, তাঁহারই গায়ে পড়ে বুঝি এক ঘা। ঠিক এই সময়ে কতকগুলা ছেলে চ্যাংদোলা করিয়া কল্যাণীকে লইয়া উঠানে নামাইল। ডাক্তার লাফ দিয়া কল্যাণীর কাছে আসিয়া হুকুম দিলেন, সোজা হয়ে দাঁড়া। তিনি যেন কল্যাণীকে এই প্রথম দেখিলেন—জবাফুলের মত রাঙা টকটকে মুখ, অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন বসন, সর্বাঙ্গ ধূলিময়, অপরাধিনীর মত নতমস্তকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সহসা বিদ্যুৎ-লেখার মত সন্তান-বাৎসল্য মুহূর্তের জন্য তাঁহার গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়কে দ্বিধা-বিভিন্ন করিয়া এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত খেলিয়া গেল, কিন্তু সে শুধু পলকের জন্য, সে আলো অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিল মাত্র।

ডাক্তার ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলেন, দুষ্টুমি করেছিস? অশ্রুরুদ্ধ

কণ্ঠে একবার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়াই পরক্ষণেই মাথা নীচু করিয়া কল্যাণী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ও ছেলের দল হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। ডাক্তার ধমক দিলেন, চুপ। কল্যাণীকে কহিলেন, মুখ তোল্, আমার দিকে তাকা; কল্যাণী ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। ডাক্তার বলিলেন, সত্যি বল্, করেছিস কি না! কল্যাণী নীরব। ডাক্তার আবার ধমক দিলেন, বল্। কল্যাণী তবু কোনও কথা কহিল না। তারপর সপ করিয়া চাবুক পড়িল। কল্যাণী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, করেছি বাবা। তারপর চাবুকের পর চাবুক পড়িতে লাগিল। কল্যাণী একবার পলাইবার চেষ্টা করিল, বার কয়েক তিড়বিড় করিয়া লাফাইল, তারপর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আর করব না বাবা, ও বাবা গো, পায়ে ধরছি বাবা, ও মাগো। তারপর উপুড় হইয়া দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দিয়া একটানা কাঁদিতে লাগিল। তখনও চাবুক পড়িতে লাগিল; দুই-একজন ডাক্তারকে থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দুই-এক ঘা চাবুক খাইয়া নিবৃত্ত হইল। পণ্ডিত তো নির্বাক। এত বেশি শাস্তি তিনি আশা করেন নাই। হাতজোড় করিয়া কহিলেন, আর থাক্ ডাক্তারবাবু, আমি ওর হয়ে মাপ চাচ্ছি। ডাক্তার তাঁহাকে ধমকাইয়া দিলেন। বলিলেন, স'রে যান।

এমন সময় ভিড়ের ওদিক হইতে এক বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া কল্যাণীর উপর উপুড় হইয়া পড়িল—সে বিশু, পুরাতন ভৃত্য, তাহার পিঠেও ঘা দুই চাবুক কশাইয়া দিয়া ডাক্তার চাবুকটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সোজা ডিস্‌পেন্সারির মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী তখন নিস্পন্দ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নির্মম কশাঘাতের প্রত্যেকটি চিহ্ন তাহার মুখে, পৃষ্ঠে, তাহার ফুলের মত কোমল শুভ্র

সর্বদেহে মোটা মোটা নীল শিরার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটিয়া উঠিতেছে।

৩

কচি সবুজ শস্যে ভরা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তাহার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত গ্রামগুলি জাগিয়া আছে। মেঘশূন্য আকাশে সূর্য অনলবর্ষণ করিতেছে। সেই রৌদ্রে ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিয়া ফিরিতেছেন। মাঠে চাষারা কাজ করিতেছে। ডাক্তারের ঘোড়া তাহারা দূর হইতে চিনিতে পারে। পেরনাম হই ডাক্তারবাবু।—বলিয়া মাথাটা প্রায় মাটির কাছে নোয়াইয়া প্রণাম করে। ডাক্তার তাহা লক্ষ্যও করেন না, সোজা চলিয়া যান।

দিন অবসানপ্রায়। সূর্য দিগন্তরেখার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় ডাক্তার একটা গ্রামে প্রবেশ করিলেন। দুই ধারে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে অন্ধকার সুড়িপথ। সেই কর্দমময় পিচ্ছিল পথে ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলেন—কখনও মাথা নোয়াইয়া, কখনও এক হাত দিয়া মুখের সামনে আসিয়া-পড়া বাঁশের ডালকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া। ভিজা মাটির স্যাঁতা গন্ধ নাকে আসিতে লাগিল, কখনও বা ডোবার পচা জলের গন্ধ। বাঁশঝাড়ের নীচে সাদা সাদা ছাতা উঠিয়াছে, একটা হেলে সাপ রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশে দ্রুত বঙ্কিম গতিতে চলিয়া গেল।

বাঁশের বন পার হইয়া একটা ছোট পুকুর; কচুরিপানায় সমস্ত পুকুরটা ছাইয়া গিয়াছে, জল পর্যন্ত দেখা যায় না। তাহার পাড়ে

একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া কতকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কে জানে! তাহার তলায় ইহার মধ্যেই অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে। সেইখানে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের ঘোড়া দেখিয়া সেই লোকটা আগাইয়া আসিল। গলায় কাপড় তো দেওয়াই ছিল, দুই হাত জোড় করিয়া ডাক্তারকে নমস্কার করিল। ডাক্তার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চৌধুরীদের বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার? লোকটা কহিল, হুজুর, আমি চৌধুরী-বাড়ির লোক, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। লোকটা পথ দেখাইয়া ডাক্তারকে লইয়া চলিল।

আঁকাবাঁকা পথ; কখনও গৃহস্থের বাড়ির পাশ দিয়া, কখনও দেবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। গৃহবধূগণ কলসীকক্ষে জল লইয়া গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে, ডাক্তারকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া তাহারা রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইল। পাঠশালার ছুটির পর ছেলেরা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছিল। তাহারা ডাক্তারের ঘোড়া দেখিয়া আপাতত গৃহগমন স্থগিত রাখিয়া ঘোড়ার পাছু পাছু চলিল। একজন বিধবা প্রৌঢ়া, মাথার চুল পুরুষের মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা এবং সেই মাথার উপরে লজ্জা-নিবারণের জন্য একটুখানি আবরণ, এক হাতে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া তিড়িং তিড়িং করিয়া এখান হইতে সেখানে লাফাইয়া অতিকষ্টে শুচিতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ছেলেগুলাকে কহিলেন, এই ছোঁড়ারা, আস্তে আস্তে চল্ না। গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে এই ভর-সন্ধ্যেয় নাওয়াবি নাকি? কে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাগা পিসী, চন্দ্র ডাক্তার আমাদের গাঁয়ে এল যে বড়? পিসী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, আর বাবা! আমাদের মহেশের মেয়েটার ভারি অসুখ,

বাঁচে কি, না বাঁচে। লোকটা কহিল, কেন, আমাদের ভূষণ? ভূষণ গ্রামের ডাক্তার।' পিসীমা কহিলেন, ভূষণই তো দেখছিল বাবা, তা কিছু করতে পারলে কই? তারপর কাছে সরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিতে লাগিলেন,' ভূষণের দোষ নেই বাবা! বিনা পয়সায় তিকিচ্ছে, মহেশের তো কিছুটি নেই, দুবেলা হাঁড়ি চড়া দায়। তবু ভূষণের আমাদের দয়াধর্ম আছে বলতে হবে। দুবেলা দেখছে, শুনছে, যতদূর সাধ্যি করছে, একটি কানাকড়িও তো মহেশের কাছে পায় নি। তারপর ঢোক গিলিয়া কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া কহিতে লাগিলেন, কাল সন্ধ্যোবেলা তুলসীতলায় ব'সে চরকার সুতো তুলছি, মহেশের বউটা এসে কাঁদতে লাগল। বলে, টাকা ধার দাও। আমি বাছা কড়ুই রাঁড়ি, কোথায় পাব টাকা? শেষে মাগী হাতের রুলি দুটো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। আমার বাছা নরম মন, কারও কান্না দেখতে পারি না; বললাম, বউ, চুপ কর, দেখি খুঁজে-পেতে; খুঁজতে খুঁজতে দেখি লক্ষ্মীর হাঁড়িতে পাঁচটি টাকা—সিঁদুর মাখানো, তাইই দিলাম। আহা, ভারি ভাল মেয়ে মহেশের! মা দুর্গার ইচ্ছায় সেরে উঠলে বাঁচি।—বলিয়া দুই হাত জোড় করিয়া যে দিকে গ্রামের দুর্গামন্দির অবস্থিত, সেই মুখ হইয়া প্রণাম করিলেন।

গ্রামের এক প্রান্তে চৌধুরীদের বাড়ি। এককালে ইহারা গ্রামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ছিল। কিন্তু কালক্রমে বংশবৃদ্ধির অনুপাতে আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় এবং ভূসম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হওয়ায় ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বাড়ি হইতে ইট ও চুন খসিতেছে, দরজা জানালা ভাঙিয়া পড়িতেছে, দেওয়ালের ফাটল হইতে গাছ গজাইতেছে; গৃহলক্ষ্মী কোন্ দিন বিদায় লইয়াছেন, অলক্ষ্মী আসর জমাইতেছে।

চৌধুরী-বাড়ির সামনে আসিয়া ডাক্তার ঘোড়া হইতে নামিয়া, যে লোকটি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তাহাকে ঘোড়াটাকে আগলাইবার জন্য হুকুম দিলেন। চৌধুরী-বাড়ির কতকগুলি যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা আগাইয়া আসিয়া ডাক্তারকে অভিবাদন করিল। ডাক্তার মাথাটা মাত্র হেলাইয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহেশ চৌধুরী কে? সকলে একসঙ্গে একজন যুবককে দেখাইয়া দিল। যুবকটির বয়স ত্রিশের বেশি হইবে না, দারিদ্র্যের মলিন স্পর্শে তাহার সুগৌর বর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ ও ম্লান, অনিবার্য বিপদের ছায়া তাহার মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে। শুষ্কমুখে সে একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল, আজ্ঞে, আমি। ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আপনার মেয়ে? বয়স কত? মহেশ কহিল, বছর দশ হবে। ডাক্তার কহিলেন, চলুন আপনার বাড়ি। কে একজন কহিল, একটুকু বিশ্রাম—। ডাক্তার রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলেন, বিশ্রাম করতে আসি নি মশায়।

ইটের তৈয়ারি ফটক, কিন্তু দরজাগুলি তালি দেওয়া। ফটক পার হইলেই ছোট এক টুকরা উঠান, তাহার এক দিকে একটি খড়ের চালওয়ালা রান্নাঘর, তাহারই সামনে দিয়া ঘরের নর্দমা ভ্যাটভ্যাট করিতেছে, উঠানের আর এক দিকে তুলসীমঞ্চ, এবং তাহারই কাছে এক টুকরা মাটির উপরে শাক-সব্জি উৎপাদনের চেষ্টা—একটা লাউয়ের ডগাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া রান্নাঘরের চালে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে মনের সুখে ডাল মেলিয়া সমস্ত চালটা ভরাইয়া দিয়াছে। আর একটু গেলে ছোট্ট একখানি রোয়াক, রোয়াকে উঠিলেই সামনে একটি লম্বা ঘর—ভিতরটা অন্ধকার, জানালার বালাই নাই, গৃহের

ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য জিনিসপত্রে সমস্ত ঘরটা ঠাসাই হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে একটু স্থান কোনমতে বাঁচাইয়া সেখানে চাটাইয়ের উপরে মলিন শয্যা পাতিয়া মেয়েকে শোয়ানো হইয়াছে। ডাক্তারকে দেখিয়া একটি মলিনবসনা অবগুণ্ঠিতা রমণী পাশের দ্বার দিয়া অন্য ঘরে উঠিয়া গেল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া নাক সিটকাইলেন। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ঢুকিল। কে একজন একটা লণ্ঠন লইয়া আসিল। তাহারই আলোকে ডাক্তার রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ একটা ভাঙা চেয়ার আগাইয়া দিল। ডাক্তার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন।

ছিন্ন মলিন শয্যার উপরে শুইয়া একটি দশ বছরের মেয়ে, বৃন্তচ্যুতপ্রায় পুষ্পের মত মলিন বিবর্ণ; লেলিহান জিহ্বা দিয়া করাল ব্যাধি যেন তাহার দেহের লাবণ্যকে লেহন করিয়া লইয়াছে; অস্থিচর্মসার দেহ বিছানার সহিত মিশিয়া আছে; জীবনপ্রদীপ স্তিমিতপ্রায়; রুক্ষ কেশের মধ্যে শুধু তাহার মুখখানি একটি কমল-কোরকের মত ফুটিয়া আছে, মরণের ছায়া এখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রোগী পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিলেন। প্রশ্ন করিলেন, কে দেখছে? ইতিমধ্যে গ্রামের ডাক্তার ভূষণচন্দ্র আসিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, আজ্ঞে, ইনি। ডাক্তার তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, কি রোগের চিকিৎসা করছেন? জবরদস্ত হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীর মত ভূষণ কহিল, ম্যালেরিয়া জ্বর, ফিবার মিক্সচার কুইনাইন দিয়েছি, বিনা পয়সায়—। ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, এ রকম রুগী কতগুলির চিকিৎসা

করেছেন আপনি? ভূষণ সম্মিলিত গ্রামবাসীগণের দিকে তাকাইয়া দম লইয়া কহিল, আজ্ঞে, বহুৎ। এই তো সেদিন রায়দের পেঁচোর—। ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, তোমার রুগীর ফিরিস্তি শুনতে চাই না আমি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়, টাইফয়েড। নাম শুনেছ কখনও? ভূষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাহার বাংলা চিকিৎসার বহিটিতে এই রোগের নাম লেখা আছে বলিয়া স্মরণ হইল। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ে যে এমন বিদঘুটে রোগ আসিয়া জুটিবে, তাহা সে জানিবে কি করিয়া? মহেশের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। এদিকে তাহার ওষুধ ও ভিজিটের দাম এক পয়সা দিবার নাম পর্যন্ত করে না, কিন্তু চন্দ্র ডাক্তারকে ডাকিবার সময় পয়সা জুটিয়াছে—নেমকহারাম! যে লোকগুলা তাহার দিকে প্যাটপ্যাট করিয়া তাকাইতেছিল—বুঝিবা দুই-একজন তাহার অবস্থা দেখিয়া মুচকিয়া হাসিতেছিল, সে মনে মনে তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল, গৃহদেবতাকে স্মরণ করিয়া কহিল, হে প্রভো! এই পাষণ্ড ডাক্তারের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। ইহার কাণ্ডজ্ঞান নাই, এতগুলা লোকের সামনে অপমান করিবে, হয়তো মারিয়া বসিবে। আর এই লোকগুলা, যাহারা প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহার ডিস্‌পেন্সারিতে চা ও তামাক ধ্বংস করে, বিনা পয়সায় ঔষধ খায়, এক বিন্দু সাহায্য করিবে না, বরং দাঁত বাহির করিয়া হাসিবে। ডাক্তার চোখ পাকাইয়া কহিতে লাগিলেন, এই মেয়েকে মেরে ফেলেছ তুমি, তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত। ভূষণের পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ডাক্তার মহেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, মিথ্যে ডেকেছেন আমাকে, চিকিৎসা করবার কিছুই নেই, আজ রাত্তির যদি পার হয় তো কাল খবর দেবেন।—বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া

পড়িলেন। মহেশ ডাক্তারের দুই হাত জড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ডাক্তারবাবু—! আর বলিতে পারিল না। ডাক্তার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, কি করব মশায়? উপায় নেই, আমার হাতের বার হয়ে গেছে।—বলিয়া ডাক্তার গটগট করিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে একেবারে অন্ধকার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা একটি নারীমূর্তি অন্ধকারে টলিতে টলিতে আসিয়া ডাক্তারের পায়ের নীচে পড়িয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু। তাঁহার জুতায় মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কহিতে লাগিল, যাবেন না ডাক্তারবাবু। যেতে দোব না আপনাকে, আমার মেয়েকে বাঁচান, আমার মেয়ে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব গো!

চন্দ্র ডাক্তার প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এরূপ অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। তিনি রোগীকে শাসন করিতে পারেন, রোগীর আত্মীয়স্বজনের পিঠেও চাবুক চালাইতে তাঁহার বাধে না; কিন্তু এই যে বিস্রস্তকুন্তলা, স্খলিতবসনা, অন্তঃপুরচারিণী নারী সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়া আসন্নমৃত্যু সন্তানের জীবন-কামনায় তাঁহার পায়ের নীচে মাথা ঠুকিতেছে, ইহাকে লইয়া তিনি কি করিবেন? তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, সান্ত্বনা দিলেন না, কাহাকেও ডাকাইয়া রমণীকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন না, চুপ করিয়া সেই বুকফাটা মর্মভেদী ক্রন্দন শুনিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন তাঁহার সমস্ত অন্তরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া রণিত অনুরণিত হইতে লাগিল; সেই ক্রন্দন তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত বিদ্ধ করিয়া করিয়া তাঁহার কোন্ তন্দ্রাগত বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে জাগ্রত করিতে লাগিল! সহসা ডাক্তারের চোখের সামনে বহুদিন

পূর্বের একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল। তখনও তিনি সংসারে ভাল করিয়া প্রবেশ করেন নাই, কল্যাণী তখন ছয় মাসের, সেই সময় কল্যাণীর শক্ত অসুখ হইয়াছিল, ডাক্তার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, তখন তাঁহার তরুণী পত্নী নারায়ণী ঠিক এমনই করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ঠিক এমনই বুকফাটা কান্না কাঁদিয়াছিল। সেই ছবি অন্ধকারের যবনিকার উপরে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল, সেই ছবি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিল। মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার প্রিয়তমা নারায়ণী কল্যাণীর জীবন-কামনায় তাঁহারই পায়ের নীচে লুণ্ঠিতা, তাহারই তীব্র ক্রন্দন অন্ধকার রাত্রির বুক চিরিয়া চিরিয়া উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সুদূর তারকালোককে স্পন্দিত করিতেছে।

শুধু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ডাক্তার আত্মস্থ হইলেন। মহেশকে ডাকিয়া কহিলেন, মহেশবাবু, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যান। দেখি কি করতে পারি!—বলিয়া ডাক্তার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া সেই ভাঙা চেয়ারে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানের কেউ ঘোড়ায় চড়তে পারে? ভূষণ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লুপ্তপ্রায় খ্যাতিকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল, আজ্ঞে আমি পারি।

আপনি পারেন? বেশ, আমার ঘোড়া নিয়ে আমার ডিস্‌পেন্সারিতে যান, কম্পাউণ্ডার এখনও সেখানে আছে।—বলিয়া খচখচ করিয়া একটা কাগজে কতকগুলা ঔষধের নাম লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, এই ওষুধগুলি নিয়ে আসবেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই।

ভূষণ কৃতার্থ হইয়া গেল। কহিল, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।—বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

তারপর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু গগনস্পর্শী তরঙ্গ তুলিয়া এই অসহায় ক্ষুদ্র জীবনতরীকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তার সুদক্ষ নাবিকের মত দৃঢ় অকম্পিত হস্তে হাল ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টায় রাত্রিশেষে জীর্ণ তরীকে কূলে উত্তীর্ণ করিলেন। রোগী নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে নিদ্রা যাইতে লাগিল। ডাক্তার তখন মহেশকে কহিলেন, মহেশবাবু, আর ভয় নেই, আপনার স্ত্রীকে মেয়ের কাছে আসতে বলুন, আমি আজ উঠি। কাল এসে দেখে যাব।—বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। মহেশ সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং সেই ধার-করা পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারকে দিতে গেল। ডাক্তার তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর অন্ধকারে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

গৃহে ফিরিয়া ডাক্তার ডিস্‌পেন্সারির দরজায় ধাক্কা দিতেই বিশু দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। নিদারুণ ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, তবু তাঁহার মনে হইতেছিল, আজ যেন তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া গিয়াছে। বিশু জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে পিসীমাকে জাগাইবার জন্য চলিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারির পাশের ঘরেই বিশু শয়ন করে। ডাক্তার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার ক্ষীণ আলোকে ডাক্তার দেখিলেন, পাশাপাশি দুইটা খাট। একটা খাটে মলিন শয্যায় কল্যাণী নিদ্রিতা। ডাক্তার প্রদীপটা কল্যাণীর শয্যার পার্শ্বে আনিলেন, কল্যাণীর শয্যায় বসিয়া সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার

গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সকালের প্রহারের চিহ্ন এখনও মিলায় নাই। একটা তীব্র অনুশোচনা তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল; ডাক্তার পরম স্নেহের সহিত সেই দাগগুলিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, যেন সমস্ত ব্যথা মুছিয়া লইতে চান। তারপর কল্যাণীর নরম কোঁকড়ানো চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া অতি সন্তর্পণে তাহার কপালে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিলেন।

বাহিরে নিঃশব্দ তারকাময়ী রজনী ছাড়া ডাক্তারের এই দুর্বলতার আর কেহ সাক্ষী রহিল না।

নান্যঃ পন্থা

শহর নেহাৎ ছোট নয়, ভদ্রপল্লীতে স্থানেরও অভাব নাই, অথচ বনমালী পণ্ডিত শহরের এক প্রান্তে চতুর্দিকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে একটা প'ড়ো বাড়িতে বাসা লইয়াছে। ইহার কারণ তাহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী সৌদামিনী। শুনিয়াছি, অনেক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষ আনয়নের কিছুদিন পর হইতে অনুতাপ করেন, কিন্তু বনমালীর অনুশোচনা দ্বিতীয়ার গৃহাঙ্গণে পদার্পণের পরমুহূর্ত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সৌদামিনী কুলীনের মেয়ে, বিবাহের সময়ে তাহার বয়স বোধ করি বিশের কোঠায় পড়িয়াছিল। সুতরাং সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় সংসারপ্রবেশে তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কিন্তু বনমালীর গৃহে প্রবেশ করিয়াই সৌদামিনী সে ক্ষতি সুদে ও আসলে পোষাইয়া লইতে লাগিল। নিরীহ বনমালীর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও উপায় রহিল না।

বনমালী শহরের স্কুলে পণ্ডিতের কাজ করে। তাহার পুরা নাম বনমালী চক্রবর্ত্তী, ছাত্রেরা ভক্তি করিয়া নাম দিয়াছে বন্য পণ্ডিত। সৌদামিনীর আবির্ভাবের পূর্বে, তাহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীর জীবিতাবস্থায় বনমালী ভদ্রপল্লীতেই বাস করিত। পল্লীর সকলেই তাহাদের খুব স্নেহ করিত; প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক পূজাপার্বণে, নিত্যনৈমিত্তিক শুভানুষ্ঠানে বনমালীর ডাক পড়িত। কোন দিন হয়তো একটি ছোট মেয়ে লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া কহিত, কাকীমা, বনুকা কোথায় গো? লক্ষ্মী মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া, গাল টিপিয়া আদর করিয়া কহিত, কেন গো রুনুমা? কোন ছেলে হয়তো আসিয়া গৃহকর্মনিরতা

লক্ষ্মীকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া কহিত, মাসীমা, মা আপনাকে আর মেসো-মশায়কে এক্ষুনি যেতে বললেন। বলিয়া ছেলেটি হয়তো তক্ষুনি বাড়ি ফিরিতে উদ্যত হইত; কিন্তু লক্ষ্মীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠ তখনই তাহার পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইত, এই সন্তু, তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছ যে বড়? শুনে যাও। ছেলেটিকে কোলের কাছে বসাইয়া, গৃহের যাহা কিছু ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়াইয়া, তাহার সহিত ছেলেমানুষী গল্প করিয়া লক্ষ্মীর সাধ মিটিতে চাহিত না। লক্ষ্মীর অনেকদিন পর্যন্ত কোনও সন্তান হয় নাই, তাই তাহার ক্ষুধিত মাতৃত্ব সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া এই পল্লীর শিশুগুলিকে বক্ষলগ্ন করিতে চাহিত।

অনেকদিন পরে লক্ষ্মী সন্তানসম্ভবা হইল। একদিন সলজ্জ হাসিতে মুখখানি সিক্তিত করিয়া নতনেত্রে বনমালীকে সেই সংবাদ জানাইল। বনমালীর প্রথমে বিশ্বাস হইল না, লক্ষ্মীর চিবুকটি ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া তাহার নিমীলিত চক্ষে, ওষ্ঠাধরে, লজ্জারুণ কপোলে এবং শরম-স্নিগ্ধ মুখের রেখায় রেখায় আসন্ন মাতৃত্বের নিগূঢ় বার্তা পাঠ করিবার চেষ্টা করিল, তারপর তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, সত্যি? তাহার বুকে মুখ রাখিয়া, ঘাড় নাড়িয়া লক্ষ্মী জানাইল, ইহা মিথ্যা নহে।

স্বামী ও স্ত্রীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বনমালী প্রস্তাব করিল; দেখ, একটা ঠাকুর রাখা যাক, এ অবস্থায় তোমার রান্না করা—। ইহার পূর্বে এ কথা শুনিলে লক্ষ্মী অত্যন্ত আপত্তি করিত, ঘাড় নাড়িয়া কহিত, আমার শরীরে কি আগুন ধরেছে নাকি যে, তোমাকে দু মুঠো সেদ্ধ ক'রে দিতে পারব না? কিন্তু এখন একটু হাসিয়া সম্মতি দিল। অন্যান্য কাজ করিবার জন্য আর একজন ঝি বাহাল হইল এবং বনমালী ও পাড়ার গৃহিণীদের অনুরোধে ভাবী শিশুর

আগমনপথকে সুরক্ষিত করিবার জন্য লক্ষ্মীকে ডজনখানেক মাদুলি বাহুতে ও গলদেশে ধারণ করিতে হইল। বিধিনিষেধের সীমাপরিসীমা রহিল না; লক্ষ্মীর স্নান ও আহার, শয়ন ও উপবেশন ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যটির উপর বনমালীর সতর্ক দৃষ্টি প্রহরা দিতে লাগিল। যে বনমালী রাত্রি দশটার পূর্বে আড্ডা হইতে গৃহে ফিরিত না, সেইই সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ি ঢুকিতে লাগিল এবং বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ভাবী শিশুর জন্য শয্যারচনানিরতা লক্ষ্মীর কানের কাছে আসন্নপ্রায় ভবিষ্যতের সুমধুর সম্ভাবনার নব নব কাহিনী গুঞ্জন করিতে লাগিল।

যথাসময়ে লক্ষ্মীর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিল। মেয়ে? তা হোক, শিশুহীন সংসারে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, আদরের কোন তারতম্য হয় না। স্বামী ও স্ত্রী দুইজনে পরামর্শ করিয়া নাম রাখিল—সাবিত্রী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে বন্ধন দশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল, এই শিশুটি তাহাতে একটি দৃঢ়তর ও মধুরতর গ্রন্থি সংযুক্ত করিল। কিন্তু লক্ষ্মীর এ সুখ বেশিদিন কপালে সহিল না। সাবিত্রীর জন্মের চারি বৎসর পরে সাবিত্রীকে বনমালীর হাতে তুলিয়া দিয়া অতি অনিচ্ছায় তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইল।

চারি বৎসরের মেয়েকে বুকে লইয়া বনমালী অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। মেয়ে তাহাকে ছাড়িতে চায় না, সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতে হয়। সন্ধ্যার পর মেয়েকে লইয়াই সান্ধ্য মজলিসে হাজিরা দেয়, রাত্রে ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে করিয়া বাড়িতে ফেরে। শেষ রাত্রে সাবিত্রী জাগিয়া উঠিয়া মায়ের জন্য কাঁদিতে থাকে। বনমালী তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভুলায়, লক্ষ্মী আবার আসিবে—আরও সুন্দরী হইয়া কত মণিমুক্তার গহনা পরিয়া; আসিবার সময় সাবিত্রীর জন্য কত রঙিন খেলনা আনিবে! আসিবার খবর যেদিন আসিবে,

বনমালী সাবিত্রীকে তাহার রঙিন ডুরে শাড়িটি পরাইয়া দিবে; মাথাটি আঁচড়াইয়া, মুখটি মুছাইয়া, কপালে টিপ আঁকিয়া দিবে, তারপর সাবিত্রীকে লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। মস্তবড় গাড়িতে চড়িয়া লক্ষ্মী আসিবে, আসিয়াই সাবিত্রীকে বুকে করিয়া চুমু খাইবে; তারপর আর কোথাও কখনও যাইবে না। মেয়ে চুপ করে, বলে, তাকে কোথাও আর যেতে দোব না তো, গেলে এবার আমি সঙ্গে যাব। বনমালী সাবিত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে থাকে, বলে, আর কোথাও যাবে না তো। তোমার জন্যে তার কত মন কেমন করছে। তুমি যেমন কাঁদছ, তোমার মাও সেখানে কত কাঁদছে। সাবিত্রী বলে, বাবা, মায়ের মন কেমন করছে? কাঁদছে? এতবড় গাড়ি রয়েছে তো এখনই চ'লে আসুক না! এমনই করিয়া মেয়ে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু বনমালীর চক্ষে আর ঘুম আসে না। মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার নিজেরই চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠে।

ক্রমে শোক শান্ত হইয়া আসে। মানুষ তো ভুলিতেই চায়! হয়তো লক্ষ্মীকে ভোলা বনমালীর পক্ষে সহজ নহে; তবু না ভুলিয়া উপায় কি? না ভুলিতে পারিলে জীবন যে দুর্বহ হইয়া উঠে। লক্ষ্মীর করচ্যুত সংসাররশ্মি বনমালী অপটু হস্তে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে, সংসারের ছোটখাট কাজে মন দিতে যায়; ঝিকে ডাকিয়া কহে, হ্যাগা, ঘরগুলো কেমন হয়েছে দেখ দিকি? সে নেই, তবু তোমাকে নিজে হতে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয় তো? ঠাকুরকে ডাকিয়া বলে, ঠাকুর, সাবু-মা কি সব খেতে ভালবাসে, তা তো তুমি জান; সেই সব দেখে শুনে রান্না ক'রো, বুঝলে? নিজে হতে সব ক'রে নিও, ব'লে দেবার লোক—। বলিতে বলিতে চোখে জল আসে। জলে বনমালীর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়।

পাড়ার দুই-চারিজন গৃহিণী পরামর্শ দেয়, ভাই, যা হবার হয়েছে, মেয়েকে তো মানুষ করতে হবে। একটি ডাগরডোগর দেখে মেয়ে বিয়ে কর।

বনমালী সজোরে ঘাড় নাড়িয়া দুই হাত জোড় করিয়া জবাব দেয়, আর না বউঠান, সেইই যখন আমাকে ঠকিয়ে পালিয়েছে, আবার? মজলিসে দুই-চারিজন মন্তব্য করে, ওহে পণ্ডিত, এ রকম মেয়ে কাঁধে ক'রে কতদিন ঘুরবে, অ্যাঁ? আজকাল সপ্তদশী-অষ্টাদশীর অভাব নেই, একটিকে দেখে শুনে ঘরে আন ভায়া, সব ঠিক হয়ে যাবে। কেহ হয়তো বলে, ওহে, ওসব কাব্যি আমাদের জন্যে নয়। ধর, তুমিই না হয় মেয়েকে মানুষ করলে, বে-থা দিলে; তারপর? তারপর বুড়ো বয়সে মুখে ভাতজল দেবে কে? নাসিকাসহ সমস্ত মুখখানা সঙিনের মত উঁচাইয়া কহে, রোগে সেবা করবে কে, অ্যাঁ? আখেরের কথা ভাব ভায়া, জীবনের এখনও ঢের বাকি। পাড়ার বোসজা মস্ত উকিল, সম্প্রতি তাঁহার তৃতীয় পক্ষ চলিতেছে, বলেন, না হে, বনমালীর ও রকম ক'রে মন ভেঙে দিও না। বনমালী যা স্থির করেছে, খুব বড় জিনিস, নিজেরা না করতে পার, অন্তত তারিফ কর, সাহস দাও। সবাই যদি একসঙ্গে নাক কাট তো 'সব লাল হো যাগা'; দু একটা আদর্শ সামনে থাকা ভাল।

কাব্য নহে, বনমালী সত্যই স্থির করিয়াছে, সে বিবাহ করিবে না। লক্ষ্মীর হাতে গড়া সংসারে আর কাহাকেও বসাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। এই গৃহের মধ্যে সে লক্ষ্মীর সাহচর্য অনুভব করে। সে মেয়েকে একলা মানুষ করিবে, বিবাহ দিবে, তারপর এ সংসারে থাকিবে না, সন্ন্যাস লইবে।

কিন্তু এই বনমালীই বৎসর খানেকের পর দেশে জমিজায়গার

বিলিবন্দোবস্ত করিতে গিয়া সৌদামিনীকে যখন বিবাহ করিয়া আনিল, কেহ আশ্চর্য হইল না। আশ্চর্য হইবে কেন? স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাংলা দেশের কোন্ স্বামীই বা সন্ন্যাস লইবার জন্য মাতামাতি না করিয়াছে, আর কেই বা দুই দিন যাইতে না যাইতে কোমর বাঁধিয়া বিবাহ করিতে না ছুটিয়াছে? তবু তো বনমালী পুরা এক বৎসর চুপ করিয়া ছিল। অন্য লোক হইলে তো স্ত্রীর শ্রাদ্ধের পূর্বেই হুঙ্কার ছাড়িয়া ফতোয়া জাহির করিত, বিবাহ না করিলে অসম্ভব। অতএব বনমালী কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই।

কিন্তু সৌদামিনীর আগমনের কিছুদিন পর হইতেই বনমালী বুঝিতে পারিল, সে ভাল কাজ করে নাই।

বিবাহের পূর্বে গ্রামের লোকেরা যখন সকলে বনমালীকে ধরাধরি করিয়া সৌদামিনীকে দেখিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তখন সে লজ্জায় তাহার দিকে তাকাইতে পারে নাই; কিন্তু সৌদামিনী তাহার দুই চক্ষের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলিয়া বনমালীকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, দেখিয়া মোহিত হয় নাই। তথাপি সে বনমালীকে অপছন্দ করে নাই। বনমালী উপার্জন করে, তাহার স্বাধীন সংসার আছে এবং সে সংসারে শাশুড়ী ও ননদের বালাই নাই। এক ফোঁটা মেয়েকে সে হিসাবের মধ্যেই আনিল না। সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, এই প্রৌঢ় বনমালীকে পতিত্বে বরণ করিলেই সে ইহার সংসারের একমাত্র অধিশ্বরী হইবে, এবং এই গোবেচারী লোকটার তাহার পায়ে দাসখৎ লিখিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। তাই বনমালীর গৃহে আসিয়া সে প্রথমে বনমালী ও তাহার মেয়ের দিকে চাহিল না, সংসার লইয়া পড়িল। বনমালীর কাছ হইতে সে তাহার হাতবাক্সের চাবি চাহিয়া লইল এবং টাকাকড়ি গুনিয়া

গাঁথিয়া লইয়া রিংসুদ্ধ চাবি অঞ্চলে বাঁধিল। ঝিয়ের কাছ হইতে ভাঁড়ারের চার্জ বুঝিয়া লইল এবং রান্নাঘরে গিয়া তৈল ও মসলার বেহিসাবী খরচের জন্য পাচককে শাসন করিল। আপিসের নূতন বড়বাবু যেমন দৃঢ় ও দ্বিধাহীন হস্তে শাসনের সম্মার্জনী চালাইয়া পূর্বতন ব্যক্তির সমস্ত প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিতে চায়, ঠিক তেমনই করিয়া সৌদামিনী এই সংসার হইতে তাহার পূর্বগামিনীর সমস্ত চিহ্নকে নিষ্ঠুর হস্তে মুছিয়া দিতে লাগিল এবং এমন সম্পূর্ণভাবে যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে ছাড়া যে এ সংসারে আর কেহ কখনও প্রভুত্ব করিয়াছিল, বনমালী হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়ী ঝিটি পর্যন্ত কাহারও তাহা মনে করিবার উপায় রহিল না।

কিন্তু সংসারের কর্তাটিকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সৌদামিনী একটু বাধা পাইল। বাহিরে বনমালী আত্মসমর্পণ করিল বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে এক ফোঁটা সাবিত্রী রক্ষাকবচের মত সৌদামিনীর সমস্ত প্রভাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাই বাহিরের সংসারে সৌদামিনীর যখন একাধিপত্য চলিতে লাগিল, অন্তরের নিভৃতে শুদ্ধ সাবিত্রীকে লইয়া বনমালী একটি ক্ষুদ্র সংসার রচনা করিল; সৌদামিনীর শাসনদণ্ড তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সৌদামিনীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একদিন সে রাত্রে শুইতে গিয়া দুই চক্ষে বিরক্তির ঝিলিক হানিয়া কটুকণ্ঠে কহিল, দেখ, এই প্যানপেনে মেয়েকে বিদেয় কর দেখি। সমস্ত দিন খেটে-খুটে রাত্রে একটু ঘুমুতে চাই, দয়া ক'রে বিয়ে ক'রে এনেছ ব'লে পাথর হয়ে যাই নি তো! বনমালীকে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইল না। পরদিন সে নিজেই ঝিকে ডাকিয়া আদেশ দিল, খুকী আজ থেকে তোমার কাছে শোবে ঝি, বুঝলে? তার বিছানা তোমার কাছেই ক'রো। তারপর প্রতিদিন

পলে পলে সৌদামিনী সাবিত্রীকে বনমালীর স্নেহরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে লাগিল। তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতে লাগিল, বনমালীর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। আহারের সময়ে বনমালী সাবিত্রীর খোঁজ করিলে সৌদামিনী নিষেধ করিয়া বলে, না না, ডাকতে হবে না, এখুনি এসে বিরক্ত করবে, খেতে দেবে না। দুই চোখে স্নেহের বান ডাকাইয়া বলে, না খেয়ে খেয়ে কি রকম শরীর হয়েছে, আরসি নিয়ে দেখ দিকি। দৃষ্টি একটু ম্লান করিয়া বলে, এ রকম করবে তো বিয়ে করেছিলে কেন? বনমালী নীরবে নতমস্তকে আহার করে। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বনমালী মেয়েকে দেখিতে চায়, তাহাকে বুকে করিয়া আদর করিতে তাহার ইচ্ছা হয়; কিন্তু সৌদামিনী তখন সাবিত্রীকে ঝিয়ের সঙ্গে বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। এমনই করিয়া বনমালী ও সাবিত্রীর মধ্যে সৌদামিনী একটি দুস্তর নদীর মত নিষ্ঠুর বেগে বহিতে লাগিল। আর তাহার দুই পারে দাঁড়াইয়া পিতা ও কন্যা পরস্পরের দিকে নিরুপায়ভাবে তাকাইয়া রহিল।

শুধু সাবিত্রীর কাছ হইতে নয়, বাহিরের সম্পর্ক হইতেও সৌদামিনী বনমালীকে বিচ্ছিন্ন করিল। সান্ধ্য মজলিসে যাওয়া বন্ধ হইল; সৌদামিনীর সন্ধ্যার সময়ে একা থাকিতে ভয় করে। পূজাপার্বণে কাহারও বাড়ি যাওয়ার উপরেও সৌদামিনীর কড়া হুকুম জারি হইল। কেহ ডাকিতে আসিলে সৌদামিনী সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেয় যে, বনমালীর পুরুতগিরি করা ব্যবসা নহে। কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে সৌদামিনী শুনাইয়া দেয়, ওর শরীর খারাপ; কারও বাড়ির যা-তা খাওয়া সহ্য হয় না।

বৎসর দুই পরে সৌদামিনীর একটি পুত্র জন্মিল। বনমালীর বশীকরণ সম্বন্ধে সৌদামিনী নিশ্চিন্ত হইল। এই শিশু ও তৎসম্পর্কীয়

প্রসঙ্গ দিয়া সৌদামিনী বনমালীর সমস্ত অবসর এমনই করিয়া ভরাট করিয়া তুলিল যে, তাহার সাবিত্রীর নাম পর্যন্ত করিবার অবকাশ রহিল না। সাবিত্রী খেয়েছে?—প্রশ্ন করিলে সৌদামিনী জবাব দেয়, খায় নি তো উপোস ক'রে আছে নাকি? তুমি কি ভাব, তোমার মেয়েকে খেতে না দিয়ে সব আমরাই গিলছি? বনমালী অপ্রস্তুত হইয়া বলে, না, তা তো বলি নি; এমনই—। সৌদামিনী ধমক দিয়া বলে, বল নি আবার কি? আবার কেমন ক'রে বলতে হবে? বলিতে থাকে, মেয়ের জন্যেই কেবল হেদিয়ে মরছেন, মেয়ে সগ্গে বাতি দেবে কিনা। সাবিত্রীকে ডাক দেয়, ওলো এই সাবি, শুনে যা। কুণ্ঠিত পদে সাবিত্রী কাছে আসে। প্রশ্ন হয়, খাস নি? সাবিত্রী ম্লান মুখখানি ম্লানতর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানায়, সে খাইয়াছে। সাবিত্রীকে যাইতে বলিয়া সৌদামিনী খোকার কথা পাড়ে। বলে, খোকন খেয়েছে কি না, তা তো কখনও জিজ্ঞেস কর না? মেয়ে কখনও আপনার হয় না গো, ছেলেই হ'ল সব। বলে, তোমার ওই মেয়ে সামান্যি নয়, মিটমিটে শয়তান; খোকনকে আমার আড়ালে মারে, আজ একটু না দেখলে কুয়োতে ফেলে দিয়েছিল আর কি। বনমালী শিহরিয়া উঠিয়া বলে, সত্যি? আহা! ছেলেমানুষ, সামলাতে পারে না। ওর কোলে দিও না। সৌদামিনী মুখভঙ্গী করিয়া বলে, ছেলেমানুষ! ওর কথা তো শোন নি? পাকা ঝুনো।

এই শিশু অধিক দিন সঙ্গীবিহীন রহিল না। বৎসরান্তে আর একটি শিশুর আবির্ভাব হইল। এমনই করিয়া বছর কয়েকের মধ্যে বনমালীর গৃহ সম্মিলিত শিশুকণ্ঠের কর্ণভেদী কলধ্বনিতে দিবারাত্র মুখরিত হইতে লাগিল। যে বনমালী বংশহীন হইবার ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিত, সেইই বংশবৃদ্ধির বহর দেখিয়া ভয়ে শুকাইয়া

উঠিতে লাগিল। সকালে ও সন্ধ্যায় টিউশনি করিতে লাগিল এবং আপনার আহার ও পরিধেয়ের স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর সম্ভব ছাঁটিয়া দিল, কিন্তু তথাপি ব্যয়ের অঙ্ককে আয়ের কোঠায় আনিবার জন্য তাহার চিন্তার অবধি রহিল না।

সাবিত্রী অনাদরে ও অর্ধাশনে বড় হইতে থাকে। তাহার বয়স বাড়িতে দেখিয়া সৌদামিনী রোষে জ্বলিয়া উঠে, বলে, এ পাপকে বিদেয় কর গো, চোখে যে আর দেখা যায় না! বনমালী বলে, চেষ্টা তো করছি। একটি ছেলে—। সৌদামিনী উত্তর দেয়, ছেলে-টেলে অত দেখতে হবে না, দাও একটা ঘাটের মড়া ধ'রে। কুলীনের মেয়ে, তার আবার অত!

সেই বৎসরেই বনমালী সাবিত্রীকে লইয়া দেশে গেল এবং দেখিয়া শুনিয়া একটি ব্রাহ্মণ-যুবকের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু বিবাহের খরচ নির্বাহের জন্য যে তাহাকে তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ গোপনে বিক্রয় করিতে হইল, সে সংবাদ সৌদামিনীকে দিতে সাহস করিল না।

বৎসর দুইয়ের মধ্যেই সাবিত্রী তাহার সিঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়া খোয়াইয়া নিরাভরণ দেহে গৃহে ফিরিয়া আসিল। বনমালী মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সৌদামিনী লাফাইতে লাগিল; কটু বিষাক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, এক চিতেয় শুতে পারলি না হতভাগী? আমার হাড় জ্বালাতে আবার ফিরে এলি? তাহার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া পাড়ার কেহ বনমালী ও তাহার মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে আসিতে সাহস করিল না।

আমরণ সাবিত্রীর ভরণপোষণ করিতে হইবে; অতএব সংসারের নূতন ব্যবস্থা হইল। পাচক ও ঝিকে ছাড়াইয়া দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ সাবিত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল। তবুও উঠিতে বসিতে

গঞ্জনার সীমা থাকে না; সৌদামিনীর তীক্ষ্ণধার রসনা কুৎসিত শ্লেষ ও ইঙ্গিতে নিরন্তর সাবিত্রীকে বিদ্ধ করিতে থাকে এবং কখনও বা নিষ্ঠুর রোষে সৌদামিনী হতভাগিনীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সাবিত্রী প্রাণপণে ক্রন্দন রোধ করে। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি এই মর্মান্তিক অত্যাচার পাড়ার সকলের অসহ্য হইয়া উঠে। কেহ হয়তো প্রতিবাদ করে, কিন্তু তাহা সৌদামিনীর নিষ্ঠুরতাকে বাড়াইয়া দেয় মাত্র। কোন প্রতিবেশী হয়তো বনমালীকে ডাকিয়া বলে, আর তো সহ্য হয় না বনমালী, এর একটা প্রতিকার কর। বনমালী চুপ করিয়া থাকে। এক মরণ ছাড়া প্রতিকারের কোন উপায় সে দেখিতে পায় না। তাই একদা-প্রাণাধিকা-প্রিয়তমা কন্যার মরণ-কামনায় বিধাতার কাছে বোধ করি নিরন্তর প্রার্থনা করে।

নিত্য অনুযোগ ও অভিযোগ সহ্য করিতে না পারিয়া বনমালী স্থির করিল—এ পল্লী ত্যাগ করিবে। তবু যে গৃহে এতদিন বাস করিয়াছে, তাহার মায়া কাটাইতে ইতস্তত করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সৌদামিনী এমন একটি নূতনতর উপদ্রবের সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে, শুধু এ গৃহে নয়, কোনও ভদ্রপল্লীতে বাস করা বনমালী অসম্ভব মনে করিল।

সহসা সৌদামিনী অত্যধিক পরিমাণে শুচিতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার কাছে সমস্ত গৃহ, গৃহের সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, মায় গৃহের বাসিন্দাগুলি সদাসর্বদা অপবিত্র বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রীকে দিয়া কূপ হইতে কলসী কলসী জল তোলাইয়া সমস্ত গৃহের মেঝে, দেওয়াল, এমন কি ছাদ পর্যন্ত স্বহস্তে ধৌত করিতে লাগিল; গৃহের বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বিছানা-বালিশ, মায় ছেলেগুলাকে দিনে পঞ্চাশবার করিয়া জলে ডুবাইয়া শুদ্ধ করিতে লাগিল; এবং নিজে

একখানা ভিজা গামছা পরিয়া রাস্তার ধারে জলের কলের নীচে মাথা রাখিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে লাগিল। লোকের কাছে বনমালীর মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে এ বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া শহরের এক প্রান্তে নামমাত্র ভাড়াতে একটা প'ড়ো বাড়িতে উঠিয়া আসিল। বাড়িটার চারিদিক ঘিরিয়া আগাছার ঘন জঙ্গল; নিকটে কোন বসতি নাই; কেবল কিছু দূরে কতকগুলা মুসলমানের বাস। বাড়ির পিছনে কিছু দূরে তালগাছে-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড দীঘি। সব দিক দিয়া বাড়িটি সৌদামিনীর মনের মত হইল।

২

একদা পূর্বাহ্ন। বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। টিউশনি সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বনমালী দেখিল, সৌদামিনী পুকুরে গিয়াছে। সে চুপি-চুপি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী রান্না করিতেছে। পূর্বের দিন একাদশী গিয়াছে। একাদশীর দিন সাবিত্রী সমস্ত দিনরাত্র জলবিন্দু স্পর্শ করে না, ক্ষুৎপিপাসায় সমস্ত দেহ শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়, সকালে বিছানা হইতে উঠিতে কষ্ট হয়। তবু এ বাড়িতে তাহার কোন দিন ছুটি মিলে না। আজও সে কোন্ ভোরে উঠিয়াছে, পুকুর হইতে কলসী কলসী জল আনিয়াছে, স্নান করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। এখনও সৌদামিনীর তরফ হইতে আহার্যের বরাদ্দ হয় নাই।

বনমালী সাবিত্রীর কাছে গিয়া চুপিচুপি ডাকিল, মা, কিছু মুখে দিয়েছিস? সাবিত্রী মুখ ফিরাইল না; কড়ায় ফুটন্ত তরকারির দিকে

তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল। তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া বনমালীর বুকখানা ব্যথায় মুচড়াইয়া উঠিল; সাবিত্রীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কোথায়? সাবিত্রী তেমনই শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, পুকুরে। বনমালী রান্নাঘর হইতে বাহির হইবামাত্র দেখিল, সৌদামিনী দুই হস্তে ও দুই স্কন্ধে একরাশ ভিজা কাপড় ঝুলাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বনমালী দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

কিছুক্ষণ পর শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বনমালী কহিল, হ্যাঁগো, আমার স্কুলে যাবার কাপড়-জামা কি হ'ল? সৌদামিনী একমনে ভিজা কাপড়গুলি শুকাইতে দিতেছিল; বনমালীর প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। বনমালী একটু স্বর চড়াইয়া কহিল, শুনতে পাচ্ছ না, না কি? আমার কাপড়? ইহার পর জবাব মিলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, কালা হই নি। কাপড়-জামা সব কেচে দিয়েছি। বনমালী বসিয়া পড়িল। আজ তাহার স্কুলে ইন্সপেক্টর আসিবে; হেডমাস্টার কড়া নোটিস জারি করিয়াছেন, শিক্ষকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া স্কুলে আসিবেন।

আর সৌদামিনী কিনা সব কাপড়-জামা, মায় ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া আনিয়াছে! প্রশ্ন করিল, এর মানে? সৌদামিনী নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, মানে তো দেখতেই পাচ্ছ। বনমালী কহিল, স্কুলে যাব কি ক'রে? সৌদামিনী বনমালীর কথার কোনও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না। রাগে বনমালীর সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল। বিগতযৌবনা সৌদামিনীর অর্ধ-উলঙ্গ কুৎসিত দেহ তাহার দুই চক্ষে হুল ফুটাইতে লাগিল; ইহার হীন আত্মসর্বস্বতা, ভাগ্যহীনা সাবিত্রীর প্রতি ইহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্তের জন্য সে

আত্মবিস্মৃত হইল। কহিল, তোমার লজ্জা করে না? সৌদামিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার দুই চোখ ধকধক করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বনমালীর সম্মুখে আসিয়া মা-কালীর মত দাঁড়াইয়া সাদা খসখসে হাতখানা বনমালীর মুখের কাছে খড়্গের মত ঘুরাইয়া কহিল, লজ্জা করে! বুড়ো মিনসে তুমি, যুবতী মেয়ের কাছে ঘুরঘুর করতে তোমার লজ্জা করে না, আমার করে, গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। বনমালীর মাথার মধ্যে যেন একটা তুবড়ি সশব্দে ফাটিয়া আগুন ছড়াইতে লাগিল; মুহূর্তের জন্য ইচ্ছা হইল, পশুর মত সৌদামিনীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুর আঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করে; যে জিহ্বা দ্বারা কন্যা ও পিতার সম্বন্ধে এই নির্লজ্জ উক্তি করিয়াছে, চিরদিনের জন্য সেই জিহ্বাকে নির্বাক করিয়া দেয়। কিন্তু তাহা দমন করিয়া রুষ্ট কণ্ঠে কহিল, মুখ সামলে কথা বল। সৌদামিনী সমস্ত উঠানটা চরকির মত এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, কি? মুখ সামলে কথা বলব? কার ভয়ে? তোমার, না তোমার ওই আদরিণী মেয়ের? রান্নাঘরের উদ্দেশে হাত নাড়িয়া কহিল, ওলো ও বাপসোহাগী, আয় লো আয়, বাপের কাছে আয়। যুগল-মিলন দেখে নয়ন সার্থক করি। রান্নাঘরের মধ্যে দুই হাতে দুই কান সজোরে বন্ধ করিয়া সাবিত্রী থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে; তাহার সমস্ত দেহ ও মন অপরিসীম লজ্জায় নিঃশব্দে ধিক্কার দিতে থাকে, ছিঃ ছিঃ!

নাচিতে নাচিতে সৌদামিনী বলে, চোখের সামনে অনাচার দেখলেই বলব। বুক চাপড়াইয়া বলে, কাউকে ভয় করব নাকি? কাকে ভয়?

ক্রমবর্ধমান ক্রোধে বনমালীর দিকে রুখিয়া আসিয়া বলে, কি করবে তুমি? মারবে? মার। বনমালীর সামনে পিঠ পাতিয়া বলে, মার দেখি! এই নির্লজ্জ দৃশ্য বনমালীর অসহ্য হইয়া উঠিল; দ্রুতপদে

গৃহের বাহির হইয়া গেল ; সৌদামিনীর ক্রোধ অসহায়া সাবিত্রীকে কি ভাবে দগ্ধ করিবে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার আশঙ্কার সীমা রহিল না।

সৌদামিনী সমস্ত উঠান নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি একটা যেন মাড়াইয়া নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের ভঙ্গীতে এক পা তুলিয়া আর এক পায়ের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, ওলো এই সাবি, শুনে যা, ওলো এই! সাবিত্রী ধীর পদে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সৌদামিনী আদেশ করিল, কি মাড়িয়েছি শুঁকে দেখ্। সাবিত্রী জানু পাতিয়া বসিয়া সমস্ত পায়ের নীচটা শুঁকিয়া কহিল, কিছু নয় তো মা। সৌদামিনী মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, কিছু নয় তো মা! তোর কি কোনও জ্ঞানগম্যি আছে যে কিছু টের পাবি? গজগজ করিয়া কহিতে লাগিল, কিছু নয়তো মা! সতীনের কাঁটা, শুঁকেও উবগার করে না!—বলিয়া উঠানের এক দিকে, যেখানে সাবিত্রী কলসী কলসী জল পুকুর হইতে আনিয়া একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা ভর্তি করিয়া রাখিয়াছে, সেই দিকে চলিতে লাগিল। সাবিত্রী রান্নাঘরের দিকে চলিল। সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল, পুকুরে চান ক'রে এসে তবে রান্নাঘরে ঢুকবি। ওই কাপড়ে হাঁড়ি হেঁসেল এক ক'রে দিস নি।

সাবিত্রী ধীর পদে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিনের বেলা পুকুরে যাইতে আজকাল সে পছন্দ করে না। তাই অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া সংসারের সমস্ত দিনের জল তুলিয়া আনিয়া রাখে। সে কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়াছে—একটা লোক এই পুকুরে আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; পুকুরের এক ধারে সে মাছ ধরার আয়োজন করিয়াছে ; সেখানে সমস্ত সকাল ও দুপুরে একটা ছিপ হাতে লইয়া বসিয়া থাকে ; যখনই সাবিত্রী ঘাটে যায়, তখনই লোকটা

নির্লজ্জের মত তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে; তাহার লোলুপ দৃষ্টি ক্ষুধার্ত কুকুরের মত লালাময় জিহ্বা দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ যেন লেহন করে।

আজ তাই চারিদিক সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া সাবিত্রী ঘাটে আসিল। পাথরে বাঁধানো প্রাচীন ঘাটটা কঙ্কাল বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। সিঁড়িগুলাতে শেওলা পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে, পা টিপিয়া না নামিলে পতন অনিবার্য। সিঁড়ির কোলে কালো জল টলটল করিতেছে। সাবিত্রী জলে নামিয়া আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া রহিল, অঞ্জলি ভরিয়া শীতল জল আকণ্ঠ পান করিতে তাহার সর্বশরীর যেন জুড়াইয়া গেল; দুই চক্ষু অপরিসীম আরামে মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি এই দীঘির প্রশান্তিময় গভীর শীতল কোলে চিরদিনের মত ঘুমাইতে পারিত!

সহসা চোখ মেলিয়া চাহিতেই সাবিত্রী দেখিল, একটা তালগাছের অন্তরাল হইতে কাহার জ্বালাময় লোভাতুর দৃষ্টি তাহার অনাবৃত দেহের পানে একাগ্র হইয়া আছে। সে দৃষ্টি শুধু দেখিতেছে না, তাহার সর্বদেহকে স্পর্শ করিতেছে, পীড়ন করিতেছে। সাবিত্রীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বুকের ভিতরটা এমনই দুলিতে লাগিল, যেন দম বন্ধ হইয়া আসে, অথচ মুহূর্তের জন্য সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। মনে হইল, কাহার কামনাময় চক্ষু তাহার জীবনের সীমাহীন গোপনতার মধ্যে সুদূরসন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া তাহার জরাগ্রস্ত শীর্ণ যৌবনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিরতিশয় লজ্জায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, মুখের উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া ধীর কম্পিত পদে জল হইতে উঠিয়া গেল।

বেলা বোধ করি দুইটা। বনমালী না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া

গিয়াছে। সৌদামিনী পুকুরে; তাহার প্রাতঃকৃত্য এখনও শেষ হয় নাই। ছেলেগুলাকে খাওয়াইয়া ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিয়া সাবিত্রী রান্নাঘরে সৌদামিনীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ, শুধু একটা পতঙ্গ একটানা গুঞ্জন করিয়া একটা মাকড়সার জালের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঞ্চরমাণ পতঙ্গটাকে জালে বাঁধিবার জন্য মাকড়সাটার কি লুব্ধ ব্যগ্রতা! সাবিত্রীর মনে হইল, তাহাকেও আয়ত্ত করিবার জন্য কে ওই ক্ষুধার্ত মাকড়সার মত লোভশানিত দৃষ্টি লইয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে! কে সে? তাহার এই অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ, বিগতশ্রী দেহটার উপরে কেন তাহার এই দুরন্ত লোভ? দুষ্ট গ্রহের মত কেন সে তাহার জীবনকে ছন্নছাড়া করিতে চায়?

সৌদামিনী আসিতে সাবিত্রী কহিল, বাবা তো খেতে আসেন নি মা। সৌদামিনী তিক্ত কণ্ঠে কহিল, আসেন নি তো আমি কি করব? পারিস তো ডেকে আন্‌গে যা।

খাওয়া সারিয়া সৌদামিনী কহিল, ভাত কোলে ক'রে ব'সে থেকে মায়া দেখিয়ে কাজ নেই। খেয়ে নিগে যা। আর দেখ্‌, ওই ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দে, ওবেলায় গিলবে অখন।

সাবিত্রী নিরুত্তর রহিল। বনমালীকে উপবাসী রাখিয়া সে খাইবে কি করিয়া? ঢকঢক করিয়া কতকটা জল গিলিয়া রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিল ও নিজের ঘরের মেঝেতে শুইয়া ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল সৌদামিনীর চীৎকারে—ওলো এই সাবি! পা দিয়া নাড়া দিয়া বলিল, রাত দুপুর পর্যন্ত ষাঁড়ের মত ঘুমোচ্ছিস যে? কাজ-কম্ম নেই? সাবিত্রী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত দুই চক্ষু দুই হাত দিয়া মুছিয়া দেখিল, অন্ধকারে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া গিয়াছে। সৌদামিনী কহিতে লাগিল, আর ঢঙ ক'রে ব'সে থাকতে হবে না।

ঘরে এক বিন্দু জল নেই ; পুকুর থেকে জল আন্‌গে যা। আপন মনে গজগজ করিয়া বলিতে লাগিল, সমস্ত দুপুর গুমোট গরমে লোকে চোখে পাতায় করতে পারে না, হতভাগীর কুম্ভকর্ণের মত ঘুম! পোড়া চোখে ঘুমও তো আসে! সাবিত্রী ধীর পদে বাহির হইয়া আসিল। এই অন্ধকারে পুকুরে যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার ভয় করিতে লাগিল। সৌদামিনীর কাছে গিয়া কহিল, মা, ওবেলার জল কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে? সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া কহিল, নিজের চোখে দেখ্‌গে যা, বিশ্বেস না হয় তো।

সাবিত্রী বুঝিতে পারিল, তাহাকে পুকুরে যাইতেই হইবে। একবার মনে হইল, বনমালীর বড় ছেলে পটলকে সঙ্গে লয়। এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেইই তাহাকে একটু ভালবাসে। কিন্তু সৌদামিনীর অনুমতি লইতে সাহস হইল না। একাকী কলসী কক্ষে লইয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল।

আসশেওড়া ও বাবলা ঝোপের মধ্য দিয়া পায়ে চলা সুঁড়িপথ অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। সাবিত্রী অতি সন্তর্পণে পথ চলিতে থাকে। প্রতি অনিশ্চিত পদক্ষেপে কোন্ অজানিত বিপদে পা দিবে, তাহা কল্পনা করিয়া তাহার আশঙ্কার সীমা থাকে না। কখনও তাহার মনে হয়, বাবলাবনের পাশ দিয়া, শুষ্কপাতার রাশিকে মর্মরিত করিয়া কে যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে! চলিতে চলিতে সে থমকিয়া দাঁড়ায়, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে তাকাইয়া থাকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। কখনও বা একটা রাত্রিচর সরীসৃপ সরসর করিয়া রাস্তার এ পাশ হইতে ও পাশে চলিয়া যায়। সাবিত্রীর পা আর চলিতে চাহে না, সমস্ত দেহের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি আঁধারে ঢাকা পথের উপরে ন্যস্ত করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া

থাকে, আবার অগ্রসর হয়। নিজের ভয় দেখিয়া তাহার হাসিও পায়। জীবনে সুখের লেশমাত্র নাই, নির্যাতন প্রতিদিন মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, অথচ মরণে কত ভয়!

দীঘির পাড়ে আসিয়া সাবিত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখের সামনে গাঢ়কৃষ্ণ আবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দীঘিটা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দিক ব্যাপিয়া একটি সুগভীর বিশাল স্তব্ধতা; চারিদিকের দীর্ঘ তরুশ্রেণী অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে সেই স্তব্ধতাকে যেন প্রহরা দিতেছে।

সিঁড়ির নীচেই কালো সাপের দেহের মত চকচকে কালো জল; তারার চুমকি-বসানো এক টুকরা আকাশ জলের মধ্যে চিকচিক করিতেছে। সাবিত্রী পা টিপিয়া টিপিয়া জলের কাছে আসিয়া, অতি সাবধানে কলসে জল ভরিয়া কম্পিত পদে উঠিয়া আসিল। জলভরা ভারী কলসী অনশনক্লিষ্ট দেহ যেন বহিতে চায় না; সাবিত্রী ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। ভাবে, বাবা এতক্ষণ আসিয়াছে বোধ হয়, বাবাই তাহাকে এখনও বোধ হয় একটু ভালবাসে। উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে কত বড় একটা তারা জ্বলিতেছে! লোকে বলে, মানুষ মরিয়া তারা হয়, তবে ওই অগণিত তারার মধ্যে তাহার মা কোন্‌টি? হয়তো ওই ছোট তারাটি; তাহারই দুঃখে বোধ হয় উহার দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহার মাকে তাহার মনে পড়ে না তো! এই অন্ধকার রাত্রে মা যদি ঐ বাবলাগাছের নীচে ধবধবে রাঙাপাড় শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! যদি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে! যদি—!

সহসা কাহার দুই সবল বাহু পশ্চাৎ হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রীর হাত হইতে কলসটা মাটিতে পড়িয়া গেল, সে 'মাগো' বলিয়া আততায়ীর স্কন্ধেই মূর্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

টিউশনি সারিয়া আসিয়া বাড়িতে পা দিতেই পটল কহিল, বাবা, দিদি কতক্ষণ জল আনতে গেছে, এখনও আসে নি। বনমালী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, সে কি রে! তোরা খোঁজ করিস নি? পটল অনুযোগের সুরে কহিল, মা যে বারণ করলে! দিদি আজ সারাদিন কিছু খায় নি বাবা। বনমালী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, হায় হায়! তবে মা আমার আর নেই রে। সবাই মিলে মাকে আমার মেরে দিলি!—বলিয়া বনমালী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন অনাহারে দেহ ঝিমঝিম করিতেছে, তদুপরি এই অকস্মাৎ বিপদবার্তায় বুকের ভিতরটা এমনই দুলিতেছে, যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, তবু তাহার চক্ষুর সম্মুখে হতভাগিনী উৎপীড়িতা কন্যার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দীঘির পাড়ে আসিয়া বনমালী প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, মাগো! সাবিত্রী! কণ্ঠস্বর ওপার হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই স্তব্ধ অন্ধকার পুরী সচকিত করিয়া বনমালী পুনঃ পুনঃ বৃথা চীৎকার করিতে লাগিল, মাগো, ফিরে আয়।

কেহ নাই। তবে কোথায় গেল? বনমালী ঘাট হইতে নামিয়া পথের উপরে থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, কলস পড়িয়া আছে, কতকটা মাটি জলে সিক্ত। তবে তো সাবিত্রী মরে নাই! বনমালী দীঘির চারি পাড়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; প্রত্যেক ঝোপ, প্রত্যেক তরুতল তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, হয়তো কোথাও সাবিত্রীর মূছিত দেহ পড়িয়া আছে। দীঘির নীচে ঘন জঙ্গল; পাগলের মত বনমালী সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথরেখাহীন জঙ্গলের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কণ্টকময় ঝোপ প্রতি পদক্ষেপে বাধা দেয়, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে; বিবরের মধ্যে সুপ্ত সর্প চকিত হইয়া দংশনোদ্যত

ফণা বিস্তার করে। বনমালীর সেদিকে লক্ষ্য নাই; দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সমস্ত চেতনা স্থান ও কালকে অতিক্রম করিয়া ধ্যানাবিষ্ট যোগীর মত কেবল এই মন্ত্র জপ করিতেছে, মাগো, ফিরে আয়।

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া রাত্রি দিনের কিনারায় পৌছিল; পূর্বাচল আসন্ন উষার অস্পষ্ট আভাসে স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং রাত্রিচর পাখির দল কুলায়ের উদ্দেশে ফিরিতে লাগিল। এমন সময়ে বনমালী দীঘির ঘাটে আবার ফিরিয়া আসিল। সেই শূন্য কলসটার কাছে, সেই সিক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া শিশুর মত বনমালী কাঁদিতে লাগিল, কোথায় গেলি মাগো?

৩

শহরে হৈচৈ পড়িয়া গেল। মফস্বলবাসীদের ভাগ্যে পরচর্চার সুযোগ সচরাচর ঘটে না। কাজেই ভগবানের কৃপায় কিছু একটা ঘটিলে, সকলে ঝাঁক বাঁধিয়া সেই মধুভাণ্ডের চারিদিকে ভনভন করিতে থাকে; কি ধনী ও দরিদ্র, কি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, কাহারও উৎসাহ এবং নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র তারতম্য দেখা যায় না। তাই সাবিত্রীর গৃহত্যাগের সংবাদ অবিলম্বে সমস্ত শহরে প্রচারিত হইয়া গেল, এবং ধনীর বৈঠকখানা হইতে আরম্ভ করিয়া চায়ের দোকান পর্যন্ত সর্বত্র ইহার টীকাটিপ্পনীসম্বলিত সরস সমালোচনায় সরগরম হইয়া উঠিল। শুভার্থীদের দল এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া অবলীলাক্রমে বনমালীর গৃহে পৌছিতে লাগিল এবং সৎপরামর্শ দিবার জন্য বনমালীকে হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

সৌদামিনী সকাল হইতে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম। হতভাগী ডুবে ডুবে জল খেত। জানি গো জানি, সব জানি, রাম না জন্মাতে রামায়ণ জানি, হতভাগী যে কুলে কালি দেবে, তা আমি অনেক আগেই জানতাম। হাত নাড়িয়া কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া বলে, মেয়ে মেয়ে ক'রে যে হেদিয়ে মরতে, ওই মেয়েই তো মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল, এখন ওই পোড়া মুখে শহরের লোক যে থুতু দেবে! ক্রন্দনের ভঙ্গীতে বলে, হতভাগী কি দুশমনি করলে মা! এখন ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে আমি কি ক'রে দিই?

বনমালী ঘরের মেঝেতে উপুড় হইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। সকলের ডাকাডাকিতে বাহির হইয়া আসিল। সকলে একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিয়া সংবাদটা সম্যকরূপে জানিতে চাহিল। দুই-চারিজনের বোধ করি ভয় ছিল, পাছে খবরটা মিথ্যা হইয়া যায়; কিন্তু বনমালীর আকৃতি দেখিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হইল।

বনমালী সংক্ষেপে সংবাদ জানাইল। সকলে খুঁটিনাটি জানিবার জন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। বনমালী সেই যে প্রথম হইতে ঘাড় হেঁট করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল, কাহারও দিকে মুখ তুলিল না বা কাহারও প্রশ্নের জবাব দিল না। পুনঃ পুনঃ ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল, ইহার বেশি কিছু সে জানে না, কিছু জানাইবার নাইও। শ্রোতার দল নিরাশ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সকলের চক্ষে নেপথ্যস্থিত গূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, অথচ বনমালীর বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর না দেখিয়া পরম শুভার্থীগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং অবশেষে পুনর্বার আসিবার ভরসা দিয়া সকলে একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

সকলে পরামর্শ দিল, পুলিসে খবর দাও, যে পাপিষ্ঠ এই দুষ্কর্ম

করিয়াছে, সরকার বাহাদুরের হস্তে তাহার শাস্তি হোক। শহরের যুবক-সমিতির পাণ্ডা মহাশয় আসিয়া বনমালীকে সাহস দিল, কোনও ভয় নাই ; চারিদিকে ফৌজ পাঠানো হইয়াছে ; যে কোন মুহূর্তে আপনার কন্যাকে আনিয়া হাজির করা হইবে ; কিন্তু তারপর দুষ্টের দমনের জন্য প্রস্তুত হউন। কলিকাতা হইতে নারীরক্ষা-সমিতির সহকারী সম্পাদক মহাশয় সশরীরে সরজমিনে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভে জলন্ত ভাষায় এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেশবাসীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন এবং পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে কলিকাতা যাইবার জন্য বনমালীকে টানাটানি করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুত্তরে বনমালী কিছুই বলিল না ; শুধু একটানা ঘাড় নাড়িয়া বোধ করি ইহাই জানাইতে লাগিল যে, সে কাহারও সাহায্য লইবে না, কাহারও কাছে যাইবে না ; যে হতভাগিনী কন্যার গৃহবাস অসহ্য হইয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া গৃহে পুরিয়া রাখিবার মত নিষ্ঠুরতা তাহার নাই।

কিন্তু বনমালীর উৎসাহ না থাকিলেও অন্য সকলের উৎসাহের অভাব ছিল না। কাজেই ব্যাপারটাকে সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া গড়াইয়া লইয়া চলিল। সভা ও সমিতি বসিল ; বক্তৃতা ও রেজলিউশনের সীমা রহিল না ; পুলিসের দারোগা আসিয়া বনমালীর গৃহের নক্শা, দরজা জানালা ও কড়ি বরগার নির্ভুল হিসাব, বনমালীর বয়স ও বেতনের পরিমাণ ইত্যাদি সারবান তথ্যে ডায়েরির পাতা ভরিয়া তুলিল ; এবং শহরের এত বাড়ি থাকিতে এই জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ো বাড়িতে বাস করিবার হেতু পুনঃ পুনঃ বনমালীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল না। পরম দুঃখের উপর

বনমালীর উদ্বেগের শেষ রহিল না; প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় পুলিসের থানায় ও উকিলের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করিয়া সে হয়রান হইয়া পড়িল।

কিন্তু সাবিত্রীর খোঁজ হইল না। সকলের উৎসাহ তৈলহীন প্রদীপের মত ক্রমে নিস্তেজ হইয়া শেষে নির্বাপিত হইল। এবং বৎসর-খানেক পর সাবিত্রীর কথা হয়তো কাহারও বিন্দুবিসর্গ মনে রহিল না।

শুধু বনমালীর বুকের মধ্যে অনির্বাণ চিতা জ্বলিতে থাকে। চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া সাবিত্রী যেন তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছে। নিদ্রায় ও জাগরণে, বিশ্রাম ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে সাবিত্রীর অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ মুখ, অশ্রুছলছল দুইটি চক্ষু সে ক্ষণমাত্রও ভুলিতে পারে না। তাই বাহিরে অকরুণ সমাজ যখন সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে সাবিত্রীর মৃত নারীত্বকে ক্ষতবিক্ষত করে, বনমালী সভয়ে দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া সকলকে এড়াইয়া চলিতে চায়। কাহারও সহিত কথা বলিতে তাহার সাহস হয় না; কেহ ডাকিলে সে চমকিয়া উঠে; কাহাকেও চুপিচুপি কথা বলিতে দেখিলে ভাবে, বুঝি সাবিত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছে। স্কুলে কাহারও সহিত সে মিশে না; টিফিনের ছুটির সময়ে যখন শিক্ষকেরা একসঙ্গে জটলা করে, বনমালী সকলের অলক্ষ্যে সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া বাহিরে একলা ঘুরিয়া বেড়ায়; স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরিতে তাহার ইচ্ছা করে না; এখানে সেখানে ফিরিয়া রাত্রি করিয়া বাড়ি ফিরে। সৌদামিনী ও তাহার পুত্রকন্যাদের উপর তাহার বিতৃষ্ণার অন্ত নাই; তাহাদের সাহচর্য যেন তাহার পরমায়ুকে ক্ষয় করে। সৌদামিনীর সমস্ত অত্যাচার এখন তাহার উপরেই পড়িয়াছে। কিন্তু সে নীরব ঔদাসীন্যের দ্বারা সমস্ত অত্যাচারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সৌদামিনী অসহ্য ক্রোধে মাতামাতি করিতে থাকে, কিন্তু বনমালীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

এমনই করিয়া বৎসর কয়েক কাটিল। একদিন রাত্রে বনমালী আহারে বসিয়াছে, এমন সময়ে সৌদামিনী কাছে আসিয়া বসিল। সচরাচর তাহাকে এরূপ দুষ্কর্ম করিতে দেখা যায় না; কাজেই ইহার পশ্চাতে কোনও গূঢ় অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বনমালী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সৌদামিনী কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তোমার কপাল ফিরেছে গো, আর পণ্ডিতি ক'রে খেতে হবে না। বনমালী সপ্রশ্ন ও সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। সৌদামিনী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার মেয়ে যে এই শহরেই ব্যবসা শুরু করেছে! বনমালীর হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিয়া যেন গলায় আটকাইয়া গেল; কষ্টে ঢোক গিলিয়া কহিল, কে বললে? সৌদামিনী বলিল, বলছিল আমাদের ঝি, বাজারে নাকি কার কাছে শুনেছে! প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বনমালীর মনে হইল, সৌদামিনী যেন একটা বীভৎস পিশাচীর মত রাশি রাশি বিষাক্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া ঘরটাকে ভরাইয়া দিতেছে।

সৌদামিনী কহিতে লাগিল, তাই ভাবছিলাম, এমনই তো মন পাওয়া যায় না, তারপর আবার রোজগেরে রূপসী মেয়ে! আমাদের কি আর মনে ধরবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে বোধ করি পথে ভিক্ষে করতে হবে।

বনমালী অর্থহীনভাবে সৌদামিনীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত ঘরটা নাগরদোলার মত ঘুরিতে লাগিল; দেহটা পাথরের মত কঠিন ও নির্জীব হইয়া আসিতে লাগিল; এবং ক্ষণকালের জন্য বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ রহিল না। আহারের স্পৃহা বাষ্পের মত উড়িয়া গেল, এবং অভুক্ত অন্ন ফেলিয়া দিয়া বনমালী টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল।

রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রাহীন চক্ষে বনমালী আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। এ কি অপরিসীম লজ্জা! তাহার কন্যা তাহারই চক্ষের সম্মুখে দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করিতেছে, ইহা তাহাকে প্রতিদিন শুনিতে হইবে, হয়তো বা কোন দিন দেখিতে হইবে। নিষ্ঠুর শ্লেষ সুতীক্ষ্ণ শরের মত সর্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া অনুক্ষণ বিদ্ধ করিতে থাকিবে; আত্মমর্যাদা, বংশমর্যাদা ধূলায় লুটাইতে থাকিবে; নীরবে নতমস্তকে সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যাহারা সাবিত্রীর দেহকে পণ্যবস্তুর মত ভোগ করিবে, তাহারা তাহাকে সাবিত্রীর পিতা বলিয়া চিনিয়া নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিবে, হয়তো তাহাকে শুনাইয়া সাবিত্রীর রূপ ও যৌবনের তারিফ করিবে। নির্বোধের মত অর্থহীন দূরদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে হইবে, কানের ভিতরটা পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও নির্বিকার-ভাবে তাহা শুনিতে হইবে। গগনস্পর্শী লজ্জার ভারে সমস্ত মাথাটা যখন নুইয়া পড়িয়া অন্ধকার গৃহকোটরে লুকাইতে চাহিবে, তখনও নিজের ও স্ত্রীপুত্রকন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দিবালোকে বাহির হইতে হইবে; নির্লজ্জের মত মাথা তুলিয়া সকলের মাঝে চলাফেরা করিতে হইবে।

এই বিড়ম্বনাময় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, লক্ষ গুণে শ্রেয়। অন্ধকারে দুই হাত জোড় করিয়া বনমালী ভগবানের নিকট মরণ প্রার্থনা করিল। দুঃখীজনের শখের মরণ-প্রার্থনা নহে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, হে ভগবান, আজিকার এই নিদ্রা হইতে যেন দিবালোকের মধ্যে আর জাগিয়া না উঠি।

বনমালী আবার ভাবিতে থাকে। দুই বৎসরের কচি শিশু সাবিত্রী তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে, অকলঙ্ক নিষ্পাপ শিশু—লক্ষ্মীর প্রাণাধিক প্রিয়তমা কন্যা। স্বামী ও স্ত্রী পরামর্শ করিয়া নাম

রাখিয়াছিল—সাবিত্রী ; অকালবৈধব্যে এবং তদুপরি দুর্গতির চরম সীমায় নামিয়া সাবিত্রী সেই নামকে ব্যর্থ করিয়াছে ; সাবিত্রী আজ গণিকা, সহস্রভোগ্যা ; পুরুষের বক্ষে লালসার বহ্নি জ্বালাইয়া পলে পলে আপনাকে দগ্ধ করিতেছে সেই সাবিত্রী।

কিন্তু শুধু কি সাবিত্রীই অপরাধিনী ? তাহার নিজের কোনও অপরাধ নাই ? তাহার গৃহে সাবিত্রী কি কষ্ট না পাইয়াছে ? দাসীর মত খাটিয়াছে, অথচ পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই ; পাইয়াছে অহর্নিশি নির্যাতন। অবশ্য সে নিজে কোনও অত্যাচার করে নাই, কিন্তু সাবিত্রীকে অত্যাচার হইতে রক্ষাও করে নাই। সাবিত্রীর কৃশ ম্লান মুখখানি তাহার চক্ষের সামনে ফুটিয়া উঠিয়া যেন নীরবে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

সহসা বনমালীর ইচ্ছা হইল, সাবিত্রীর কাছে যাইবে ; তাহাকে বুকে করিয়া ফিরাইয়া আনিবে, বলিবে, মাগো, যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার শাস্তি খুব দিয়াছিস, বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্, ফিরিয়া আয়।

পরদিন প্রভাত হইতে বনমালীর মনের মধ্যে আসন্ন প্রিয়সমাগমের একটি আনন্দ ও বেদনাময় সুর বাজিতে লাগিল। সারাদিন সে কাহারও সহিত কথা কহিল না, কোন কাজে মন দিতে পারিল না। সাবিত্রীকে আজ দেখিতে পাইবে, সেই চিন্তা আর সব কিছু চিন্তাকে ছাপাইয়া সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রহিল। মনে মনে অবিরাম এই কথা বলিতে লাগিল, সাবিত্রী যেদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেদিন যেমন সেই নবজাত শিশুকে সমস্ত ক্লেদ ও গ্লানি হইতে নির্বিচারে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলাম, আজিও তেমনই কোন দ্বিধা না করিয়া, কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে সমস্ত পঙ্কিলতা হইতে অকুণ্ঠিতভাবে বক্ষে তুলিয়া লইব।

শহরের বড় রাস্তা হইতে একটি সরু গলি যেখান হইতে পতিতা পল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে বনমালী সেখানে উপস্থিত হইল। গলিটার মাথাতেই একটা দোকান; দোকানী একটা চৌকির উপরে বসিয়া ফুলুরি ভাজিতেছে; বিশ্রী তেলের গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভরপুর; দোকানে একটা গ্যাসের আলো, সামনে ভিড় করিয়া কতকগুলা স্ত্রী ও পুরুষ জটলা করিতেছে। বনমালী সেখানে মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, কি যেন ভাবিল, তারপর দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল।

স্বল্পালোকিত অপরিসর পথ; দুই পাশে ছোট ছোট ঘরের শ্রেণী; অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া পচা জলের নর্দমা অকাতরে দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। অধিবাসিনীরা কেহ ঘরের মধ্যে প্রসাধনরতা, কেহ বা ঘরের সামনে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া বসিয়া রাস্তার অপরপার্শ্ববর্তিনী সখীর সহিত রসালাপমগ্না। কোনও ভাগ্যবতীর গৃহে ইহার মধ্যেই ঝিকিঝিকি শুরু হইয়া গিয়াছে; অপটু কণ্ঠের কদর্য সঙ্গীত, নৃত্যচঞ্চল চরণের নূপুরনিক্কণ, মত্ত পুরুষের পরুষ কণ্ঠের চীৎকার ভাগ্যহীনা প্রতিবেশিনীর নিষ্ফল রূপসজ্জাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। বনমালী দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে তাহার সাবিত্রী কোথায়? কোথায় সে সর্বাঙ্গে রূপের দীপালী জ্বালিয়া নয়নে নিবিড় আবেশ রচিয়া কামার্ত পুরুষের মনোহরণ করিতেছে? এ রাস্তায় আলোর বালাই নাই; অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসে; দুই চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া বনমালী চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়িগলি পঞ্জরাস্থির মত রাস্তা হইতে বাহির হইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সব গলিতে ঢুকিতে বনমালীর ভয় করে, যেন সর্পের বিবর; প্রবেশ করিলেই হিমশীতল ক্লেদাক্ত বন্ধন সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিবে। তবু বনমালী অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে থাকে;

দুই পাশে ছোট ছোট খোলার ঘর ; প্রতি দ্বারে কান পাতিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরকে খুঁজিয়া ফিরে। কখনও বা প্রতীক্ষমানা কোন বারবনিতার কাছে গিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কেহ উপহাস করে, কেহ গালাগালি দেয়, কোন কৌতুকপরায়ণা হয়তো টানিয়া ঘরে ঢুকাইতে চায়। বনমালী দুই বিস্ময়পরিপূর্ণ চক্ষু চপলা রমণীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলে, মাগো, তুইই কি আমার সাবিত্রী? বারাঙ্গনা সলজ্জে জিভ কাটিয়া হাত ছাড়িয়া দেয় ; প্রশ্ন করে, সাবিত্রী কে ঠাকুর? সে কি তোমার মেয়ে? বনমালী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, হ্যাঁ মা, আমার মেয়ে, এখানে আছে। রমণীর দুই হাত ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে, মাগো, তুই জানিস, কোথায় আমার সাবিত্রী? মেয়েটি হয়তো সাবিত্রীকে চেনে না, তাহার সঙ্গে যায়, ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করে ; কেহ হয়তো সংবাদ দিতে পারে না ; বনমালী আগাইয়া চলে।

এমনই করিয়া বনমালী সাবিত্রীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। পরিশেষে অদূরে একটি মেয়েকে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা গলির মাথায় মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে ; হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে ; তাহার সামনে দাঁড়াইয়া একটা লোক, বোধ করি মাতাল। তাহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া মেয়েটি কথা কহিতেছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে বনমালীর মনে হইল, এই মেয়েটি হয়তো সাবিত্রী—তেমনই গঠন, তেমনই মুখের ডৌল। তবু সাবিত্রী বলিয়া ইহাকে চিনিতে বাধে। বনমালীর অন্তরের মধ্যে যে সাবিত্রী শান্ত, সকরুণ, সর্বহারা মূর্তিতে অহরহ বিরাজ করিতেছে, তাহার সহিত এই মেয়েটির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহার মাথার চুলে, চোখে, মুখে, বাহুতে, বক্ষে ও সর্বদেহে ক্ষয়িষ্ণু যৌবনকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কি নির্লজ্জ প্রয়াস! সুকেশী

নহে, অথচ কত যত্নে পরিপাটি করিয়া কবরী রচিয়াছে ; চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে, হয়তো চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, তবু দুই চক্ষে সযত্নে কাজল-রেখা আঁকিয়াছে ; শুষ্ক ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়াছে, লাবণ্যহীন শীর্ণ দেহকে রঙিন বসনে ঢাকিয়াছে এবং অলক্তকরসে চরণ দুইটি রাঙা টুকটুকে করিয়াছে। এই হাস্যচঞ্চলা, সুসজ্জিতা, ছলনাময়ী নারীর মধ্যে নিরাভরণা, লাজনম্রা, ম্লানমুখী সাবিত্রীর সন্ধান কোথায় ? অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বনমালী সেই মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি তখনও হাসিতেছে ; বোধ করি, সেভাবে হাসিলে তাহাকে ভাল দেখায় ; লোকটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিতেছে, ঘরে আয় না ভাই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মসকরা করিস কেন ? লোকটা ঘাড় নাড়িয়া স্খলিত কণ্ঠে বলে, উঁহু, না, ঘরে ঢুকছি না বাবা। আগে দরদস্তুর ঠিক হয়ে যাক। মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, লোকটার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়, মুখের কাছে মুখ লইয়া আসে ; আশা করে, তাহার কেশের সুরভি, সদ্যস্নাত দেহের স্নিগ্ধতা, অর্ধাবৃত বক্ষের মাদকতা লোকটাকে মুগ্ধ করিবে। লোকটার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলে, তুই যে ভারি হিসেবী হয়েছিস রে ! লোকটা বিন্দুমাত্র কাবু হয় না, বেপরোয়াভাবে বলে, হিসেবী আর কি ? বাজারে এসে দরদস্তুর ক'রে জিনিস নোব না ? যেমন যেমন জিনিস, তেমনই তেমনই দাম ; সোনার দরে গিলটি নোব কেন বাবা ?—বলিয়া নিজের রসিকতায় হি-হি করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে। মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্য কালো হইয়া উঠে ; পরমুহূর্তেই হাসিয়া বলে, চল্, ঘরে চল্, তোর সঙ্গে আবার দরদস্তুর কি ভাই ? হঠাৎ অন্ধকারে দণ্ডায়মান বনমালীর দিকে তাহার নজর পড়ে, বলে, কে ভাই দাঁড়িয়ে, দেখ্ তো এগিয়ে ? লোকটা বনমালীর দিকে তাকাইয়া বলে, কে বাবা কুঞ্জের দ্বারে ঘুরঘুর করছ ?

বলে, খ'সে পড় বাবা, এগিয়ে দেখ। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলে, এখানে আজ টু-টু ইজ দি।

বনমালী এতক্ষণ নিঃশব্দে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। মেয়েটি যে সাবিত্রী নহে, এই সম্বন্ধে তাহার কোনও সন্দেহ রহিল না। যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গভীরতম পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও সাবিত্রীর সমস্ত চিত্ত মুক্তি-প্রত্যাশায় পঙ্কজিনীর মত নির্নিমেষে ঊর্ধ্বাকাশপানে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ মেয়েটির মধ্যে সে ব্যাকুল প্রত্যাশা কই? পূতিগন্ধি পারিপার্শ্বিকতার উপরে কোথায় তাহার মর্মান্তিক ঘৃণা? এ তো পঙ্কিল পল্বলের মধ্যে শূকরীর মত পরম উল্লাসে গড়াগড়ি দিতেছে! তাহার সমস্ত অন্তর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, এ আমার সাবিত্রী নয়, হইতে পারে না। বনমালী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মেয়েটি আগাইয়া কহিল, আয় না রে, দেখ্ না! লণ্ঠনটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কে গো, এদিকে এগিয়ে এস না! সেই লণ্ঠনের আলোকে তাহার মুখের চেহারা পরিপূর্ণভাবে বনমালী দেখিতে পাইল। কে যেন তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া তাহার কানের কাছে চীৎকার করিয়া কহিল, দেখ্, দেখ্, এইই তোর সাবিত্রী। অপরিসীম ব্যথায় বনমালী চীৎকার করিয়া উঠিল, সাবিত্রী! দুই চোখ দুই হাত দিয়া সজোরে মুদ্রিত করিয়া, পিছন ফিরিয়া, টলিতে টলিতে সে ছুটিতে লাগিল। বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি, এই আমার সাবিত্রী! লোকটা বেয়াড়া গলায় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল। চ'লে আয়। সাবিত্রী প্রস্তর-প্রতিমার মত তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্ধকারে অপস্রিয়মান বনমালীর মূর্তির পানে তাকাইয়া রহিল।

বনমালী ছুটিতে লাগিল। চাহিতে সাহস করিল না, পাছে সাবিত্রী

আবার চোখে পড়ে। তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথার মধ্যে জড়ো হইয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল এবং সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তবু জড়প্রায় পা দুইটা টানিয়া টানিয়া চলিতেই লাগিল এবং কখন যে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সম্বিৎ লাভ করিয়া বনমালী বুঝিতে পারিল, সে একটা বেঞ্চির উপরে শুইয়া আছে। চোখ খুলিয়া দেখিল, মোড়ের সেই গ্যাসের বাতিওয়ালার দোকান, চারিদিকে লোকের ভিড়। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া কে একজন ভক্তিভরে কহিল, প্রভো! ধ্যানভঙ্গ হ'ল কি? দূরে কে কহিল, আমাদের স্কুলের পণ্ডিত না? এসব বিদ্যেও আছে নাকি? কে উত্তর দিল, দেখতে ভিজে বেড়ালটি হ'লে কি হবে মশায়, ডুবে ডুবে জল খান। একজন মাতাল ধমক দিয়া কহিল, অ্যাই, চোপরাও! ব্যাটা, লোক চেন না? উনি সাধুলোক, আমার ইষ্টিগুরু, এ পাড়ার সকলের ইষ্টিগুরু। শিষ্যের কাছে নিন্দে করলে গলাটি টিপে মুচড়ে দোব। বনমালীর কাছে আসিয়া কহিল, গুরুদেব, এক পাত্তর অমৃতের হুকুম হোক। বনমালী উঠিয়া বসিল, লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। দোকানী কহিল, কি পণ্ডিত মশায়, হেঁটে যেতে পারবেন, না গাড়ি ডেকে দোব? বনমালী উঠিয়া দাঁড়াইল, টলিতে টলিতে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল; পিছনে কটু ইঙ্গিত মুখে মুখে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পরদিন শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও শুনিতে বাকি রহিল না যে, শহরের হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত বেশ্যাপল্লীতে মাতাল হইয়া নর্দমায় পড়িয়া ছিল, সকলে ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শহরের লোক 'ছি ছি' করিতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতের এই কাণ্ড!

ভদ্রলোকেরা দল বাঁধিয়া স্কুলের সেক্রেটারি ও হেডমাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বৈঠক বসাইয়া স্থির করিল, বনমালীকে অবিলম্বে তাড়ানো হোক, নচেৎ স্কুলের মঙ্গল নাই।

বনমালীর বাড়িতে সৌদামিনীর কানে যথাসময়ে এ সংবাদ পৌঁছিল। সৌদামিনী তুড়িলাফ খাইতে লাগিল। একটা চেলাকাঠ হস্তে করিয়া সাধ্বী সতী স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু বনমালী সকালেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে; তাহার দেখা মিলিল না। কাজেই বেচারী বনমালীর অভাবে ছেলেগুলাকে ঠেঙাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে লাগিল।

বনমালী বাড়িতে না ফিরিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। শিক্ষকেরা তাহাকে দেখিয়া কেহ মুচকিয়া হাসিল, কেহ বা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত দৈহিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ক্লাসে ঢুকিতেই বিদ্যুৎবার্তার মত কি ইঙ্গিত ছেলেদের চোখে খেলিয়া গেল! টিফিনের ছুটির সময়ে হেডমাস্টার মহাশয় সহকারী শিক্ষকদের লইয়া বনমালীর সম্বন্ধে কিংকর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বনমালী রাস্তার পারে একটা ঝাউগাছের নীচে বসিয়া শুষ্কমুখে সম্মুখে দিগন্তব্যাপী রৌদ্রদগ্ধ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। উপরে ঝাউগাছের পাতাগুলা অবিশ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বায়ু মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে খাইতে, ধূলা বালি খড় ও পাতা উড়াইতে উড়াইতে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে সুদূর আকাশ হইতে চিলের তীক্ষ্ন স্বর কানে আসিতে লাগিল। বনমালী স্তব্ধভাবে বসিয়া বসিয়া গতরাত্রির কথা ভাবিতে লাগিল, কেন চলিয়া আসিলাম? আমি তো সাবিত্রীকে হীনতম গ্লানি হইতে অকুণ্ঠিত চিত্তে বুকে তুলিয়া লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম;

তবে ভীরুর মত পলাইয়া আসিলাম কেন? কাল রাত্রি হইতে আজ সারা সকাল সে এই কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াছে এবং এখনও সেই চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল।

স্কুলের ছুটির পর হেডমাস্টার মহাশয় বনমালীকে আফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং যথারীতি দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বনমালীকে শিক্ষকতা হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। বনমালী নির্বিকারভাবে এ সংবাদ শুনিল, বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, পুনর্বিবেচনার জন্য একটি বারও অনুরোধ করিল না; জানাইল না যে, পরদিন হইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়া জীবিকার্জনের আর কোনও উপায় তাহার রহিল না। শুধু ভাবলেশহীন মুখে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হেডমাস্টার মহাশয় তাহার হাতে নোটের একটি ছোট বাণ্ডিল দিয়া স্কুল হইতে তাহার সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিলেন। বনমালী তাহা পকেটে পুরিয়া এবং হেডমাস্টার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বনমালী সাবিত্রীর দরজায় পৌঁছিল। দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। সামনেই এক টুকরা ছোট উঠান, তাহা পার হইলেই ছোট বারান্দাযুক্ত খড়ের চালওয়ালা মাটির ঘর। সমস্ত উঠানটা তরল অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে; এখনও আলো জ্বালা হয় নাই। বনমালী উঠানে দাঁড়াইয়া দেখিল, সেই অন্ধকারে বারান্দায় মেঝের উপর সাবিত্রী উপুড় হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। কোথায় তাহার বেশভূষার পারিপাট্য! কোথায় তাহার হাস্যোজ্জ্বল লীলাকৌতুক! রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলা কতক

পিঠে, কতক মাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; রিক্তাভরণ শীর্ণ দেহ ; মলিন বসনাঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছে। আজ আর তাহাকে সাবিত্রী বলিয়া চিনিতে বাধে না। তাহার মাথার কাছে আসিয়া বনমালী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী মাথা তুলিল না। বনমালী ডাকিল, সাবিত্রী! সাবিত্রী মুখ তুলিল ; কাল সারারাত্রি, আজ সমস্ত দিন সে কাঁদিয়াছে ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী ডাকিল, কে ? বাবা ? তারপর দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, বাবা গো! এতদিন পরে হতভাগীকে মনে পড়ল ? বনমালী সাবিত্রীর মাথার কাছে বসিয়া তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইল এবং একদা-ক্রন্দনমানা শিশু সাবিত্রীকে যেমন করিয়া শান্ত করিত, আজও ঠিক তেমনই করিয়া সাবিত্রীর মুখে মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার কোলে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ; বনমালীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নিঃশব্দে নামিয়া সাবিত্রীর মাথার চুলকে সিক্ত করিতে লাগিল। এমনই করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সাবিত্রী ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। বনমালী কহিল, মা, আমি তোকে নিতে এসেছি। সাবিত্রী কোনও কথা বলিল না, তেমনই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। বনমালী কহিতে লাগিল, সমাজ, সংসার, আমি কাউকে মানব না ; তোকে নিয়ে আমি এখান থেকে চ'লে যাব। আমার বয়স হয়েছে, বোধ করি মরণেরও বেশি দেরি নেই। তোর কোলে আমি মাথা রেখে মরতে চাই মা। সাবিত্রী তেমনই ভাবেই থাকিয়া কহিল, মায়ের মত হয়েছে ? বনমালী কহিল, তার মতের তো কোন প্রয়োজন নেই মা। সে যখন আমাদের মুখের দিকে তাকায় নি, আমরাও তার মুখের দিকে তাকাব না। সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তা হয় না ; তোমাকে ছন্নছাড়া

করতে আমি পারব না। বাবা, তুমি ফিরে যাও। এক মরণ ছাড়া কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

বনমালী কহিল, মা, তোর কোনও ভাবনা নেই। তোর মা আর ছেলেদের সব ব্যবস্থা আমি করব। তোর সঙ্গে থাকতে চায় ভাল, না হয় দেশে পাঠিয়ে দোব। তাদের কোনও কষ্ট হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাবিত্রী কহিল, কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? বনমালী কহিল, যেখানে হোক, শুধু এখানে আর নয়। সাবিত্রী বোধ করি মৃদু হাসিল, কহিল, বাবা, সমাজ কি শুধু এখানেই? সারা দেশ জুড়ে, সমস্ত মানুষের মনের মধ্যে সমাজ। এক পশুপক্ষী ছাড়া কে আমাকে ক্ষমা করবে? বাবা, তুমি এখনও তেমনই ছেলে-মানুষ আছ। এই কয়েক বৎসরে সাবিত্রীর বয়স যে কত বাড়িয়াছে, তাহা মূর্খ বনমালী জানিবে কি করিয়া?

সাবিত্রী উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে বনমালীর দিকে তাকাইয়া কহিল, বাবা, তুমি ভারি কাহিল হয়ে গেছ। মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে খুব ভাবতে, না বাবা? বনমালী কহিল, আমার যে কি ক'রে দিন কেটেছে, তা আমিই জানি। তোকে আজ না নিয়ে আমি যাব না। আমি বুঝেছি মা, তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। সাবিত্রী বনমালীর আরও কাছে সরিয়া আসিল, কহিল, বাবা, তোমাকে এমন ক'রে আমি কখনও পাই নি। জানতুম, তুমি আমায় স্নেহ কর; কিন্তু যে এতখানি স্নেহ কর, তা কোন দিন ভাবি নি। এই হতভাগীর জন্যে তুমি নরকের মধ্যে এলে বাবা? বনমালী সাবিত্রীর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। সাবিত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। এই কদিনে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি; অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা আমি কামনা

করি না ; শুধু তোমাকে দেখবার জন্তে আমার এখানে আসা। এই নরকের মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাব, কে আমায় ব'লে দিয়েছিল জানি না, কিন্তু দেখা তো পেলাম। আর আমার কোন আশা নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।—বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বনমালী সাবিত্রীর শীর্ণ মুখখানি তুলিয়া কহিল, মাগো, তোর কি হয়েছে? তোকে আমি নিয়েই যাব মা। অমত করিস নি। সাধ্য হয় বাঁচাব, আর যদি মরিস তো আমার কোলেই মরবি। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাবিত্রী বলিতে লাগিল, আমাকে তুমি নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো না। বিধাতা আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, নিজে জ্ব'লে পুড়ে মরছি। যার কাছে যাব, তাকেও জালিয়ে মারব। এ জীবনে অনেক দুঃখ পেলাম, আর কারও অভিশাপ কুড়োতে চাই না। বাবা, তুমি কিছু মনে ক'রো না, অভাগীর ওপরে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ রেখো না। যাবার উপায় থাকলে আমি যেতাম। তোমার সঙ্গে যেতে না পারা যে আমার কতবড় দুর্ভাগ্য, তা যারা আমার মত অভাগী, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা, তুমি ফিরে যাও, মনে ক'রো, সাবিত্রী ম'রে গেছে।

বনমালী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, তা আমি যে মনে করতে পারি না মা, আমার সমস্ত বুক জুড়ে তুই যে ব'সে আছিস।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতে লাগিল, সাবিত্রীকে কোনমতে সম্মত করিতে না পারিয়া বনমালী কহিল, তবে আমি যাই মা, আর বোধ হয় দেখা হবে না। সাবিত্রী উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিল, সে কি বাবা? বনমালী কহিল, তুই পর্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকালি না, আর কেন? সাবিত্রী হাসিল, ছেলেকে অবুঝ দেখিয়া মা যেমন করিয়া হাসে, ঠিক তেমনই হাসিল ; অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইল

না, উঠিয়া দরজার দিকে চলিল। সাবিত্রী পিছু পিছু চলিল। দরজায় আসিয়া বনমালী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কি যেন ভাবিল, তারপর স্কুল হইতে যে নোটের বাণ্ডিল পাইয়াছিল, তাহা সাবিত্রীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া, সাবিত্রী কিছু বলিবার পূর্বেই, দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনমালী যখন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হইয়া গিয়াছে, দ্বারে আঘাত করিয়া ডাক দিল, দরজা খোল। কাহারও নিদ্রাভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল না। পুনঃ পুনঃ ডাক দিতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ হইল। বোধ করি, সৌদামিনী উঠিয়া শয়নকক্ষের দ্বার খুলিল। অনতিবিলম্বে সৌদামিনীর কণ্ঠধ্বনি বনমালীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, কে?

বনমালী কহিল, আমি। দরজাটা খুলে দাও।

সৌদামিনী সেইখানে দাঁড়াইয়া কহিল, এত রাত্রে এখানে মরতে এলে কেন? সারাদিন যে চুলোতে মরছিলে, সেখানে জায়গা হ'ল না?

বনমালী কহিল, আগে দরজাটা খুলে দাও।

বনমালীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সৌদামিনী কহিল, দরজাটা খুলে দাও! কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা চড়াইয়া কহিল, কে তোমার মাইনে-করা বাঁদী আছে শুনি যে, রাতদুপুরে দরজা খুলে দেবার জন্যে ব'সে আছে?

বনমালী নিরুত্তর, ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় তাহার ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত দেহ টলিতেছিল, মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছিল। সৌদামিনী হাঁক দিয়া কহিল, হতচ্ছাড়া, বুড়ো মিনসে! সারারাত্রি নটীর বাড়িতে কাটিয়ে রাত-দুপুরে ফিরে কেতাথ করেছেন, ওঁকে দরজা খুলে দিতে হবে, পা ধুইয়ে বাতাস করতে হবে! ক্রোধ বাড়িয়া উঠে, দাঁত-কিড়মিড় করিয়া কহে,

দোব, মুখে হুড়ো জেলে দোব, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। চ'লে যাও, কে তোমার কোথায় আছে, রাত-দুপুরে মাতলামি করতে হবে না। বনমালী ডাকিয়া কহিল, ও ঝি, দরজাটা খুলে দাও তো। সৌদামিনী ধমকাইয়া কহিল, কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দেখি যে, দরজা খুলে দেয়! কহিল, এখানে মাতালের জায়গা নয়, চ'লে যাও। ও মুখ আর দেখিও না, গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যাও, আমার হাড় জুড়োক।

আবার দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে আসিল। সৌদামিনী বোধ করি শুইয়া পড়িল। সব নিস্তব্ধ, দূরে একটা গাছের উপরে কতকগুলা পেচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল।

বনমালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি, রাস্তা জনমানবশূন্য। শুধু মধ্যে মধ্যে রাস্তার পাশে দুই-একটা কুকুর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। বনমালীর পদশব্দ শুনিয়া তাহাদের কেহ কেহ ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বনমালী টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল। সমস্ত দিন কণামাত্র অন্ন, বিন্দুমাত্র জল পেটে যায় নাই, সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, পা দুইটা আর চলিতে চাহিতেছে না; মনে হইতেছে, পথের ধারেই কোথাও সর্বাঙ্গ এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে; তবু চলিতে লাগিল। কোথায় যাইতে হইবে, জানা নাই। শুধু চলা আর ভাবা, পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই; স্ত্রী তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, সাবিত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সমাজ তাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া জানিয়াছে। এক মরণ ছাড়া তাহার আর কোনও আশ্রয় নাই। সৌদামিনী বলিয়াছে, সে মরিলে তাহার হাড় জুড়াইবে। হাঁ, সে মরিবে। বাঁচায় কোন প্রয়োজন

তো নাই। ছেলেপিলে? তা সে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা তাহাদের কি করিবে? তাহাদের দুর্দশা চোখে দেখার চেয়ে মরণই তো ভাল।

বনমালীর ভাবনার অন্ত নাই। ক্ষুৎপিপাসার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে এবং গতি দ্রুততর হইয়া আসিতেছে। জীবনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই, সুখের আশাও নাই; লক্ষ্মীর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সুখ ও শান্তির শেষ হইয়াছে। লক্ষ্মীর কথা বনমালীর মনে পড়িল—সুন্দরী কল্যাণময়ী লক্ষ্মী, রূপে গুণে সার্থকনাম্নী লক্ষ্মী, তাহার যৌবনশ্রীমণ্ডিত শান্ত কোমল মূর্তি বনমালীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বনমালী হাসিয়া কহিল, আজ শেষের দিনে দেখা দিতে আসিয়াছ, এতদিন তো মনে পড়ে নাই! ম্লান করুণ হাসি হাসিয়া সে মূর্তি অদৃশ্য হইল। বনমালী ভাবিতে লাগিল, মরিতেই হইবে! জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত তাহাকে যেন দংশন করিতেছে। এতদিন কি করিয়া বাঁচিয়া আছে, ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইল। ভাবিয়া দেখিল, তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কম নয়। এই পঞ্চাশ বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত পার হইয়া তাহার হৃদয় রক্তাক্ত হইয়াছে; আর মুহূর্তের বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছে না; যেখানে হোক, যেমন করিয়া হোক, এখনই তাহাকে মরিতে হইবে। সহসা তাহার মনে হইল, কে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে; কাহার পদশব্দ সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল। পিছনে তাকাইল, কে যেন সরিয়া গেল; আবার চলিতে লাগিল, আবার সেই পদশব্দ; খুব কাছে, ঠিক যেন তাহার পাশেই, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস তাহার গায়ে লাগিতেছে, কেশের সুরভি যেন নাকে আসিতেছে! বনমালী আর তাকাইল না, পাছে সে চলিয়া যায়। সে যেন এই অদৃশ্যচারিণীর সঙ্গ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, লক্ষ্মী আসিয়াছে, তাহাকে লইতে আসিয়াছে। ডাক দিল, লক্ষ্মী! কে

যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বনমালীও হাসিয়া কহিল, নিতে এসেছ? আমি জানি, তুমি আসবে। ভারি কষ্ট পেয়েছি লক্ষ্মী।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। পূর্বাকাশে কৃষ্ণাদ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দিয়াছে। তাহার ম্লান আলোকে অন্ধকার একটু ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে; বনমালী এক মাঠের মধ্যে একটা ভাঙা ঘরের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, লক্ষ্মী, কি ক'রে মরব? লক্ষ্মী কহে, কেন, সৌদামিনী—? বলিতে হইল না। বনমালীর মনে পড়িল, সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়া মরিতে বলিয়াছে। গলায় চাদর ছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিল। দেখিতে পাইল, ভাঙা ঘরের পাশেই একটা কি গাছ রহিয়াছে। বনমালী জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া মাটিতে রাখিল, পকেটে কয়েকটা পয়সা ছিল, ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল। বনমালী ভাঙা দেওয়ালে পা দিয়া গাছে উঠিল; চাদরটা পাকাইয়া এক প্রান্ত গলায় বাঁধিয়া এবং অন্য প্রান্ত একটা ডালে বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে পথচারী পথিকেরা রাস্তা হইতে দেখিতে পাইল, অদূরে ভাঙা ঘরের পাশে একটা গাছ হইতে, পিছন ফিরিয়া, মাথাটা এক পাশে কাত করিয়া, কে একটা লোক ঝুলিতেছে। তাহাদেরই একজন জামাটার কাছে গিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল এবং জামাটার পকেট হাতড়াইয়া পয়সাগুলি বাহির করিয়া লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

জীবনকে অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীর সীমা পশ্চাতে ফেলিয়া, কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রালোকিত লোকলোকান্তরবিসর্পী মরণপথে বনমালী তখন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।